মাসুদ রানা

শয়তানের উপাসক

কাজী আনোয়ার হোসেন

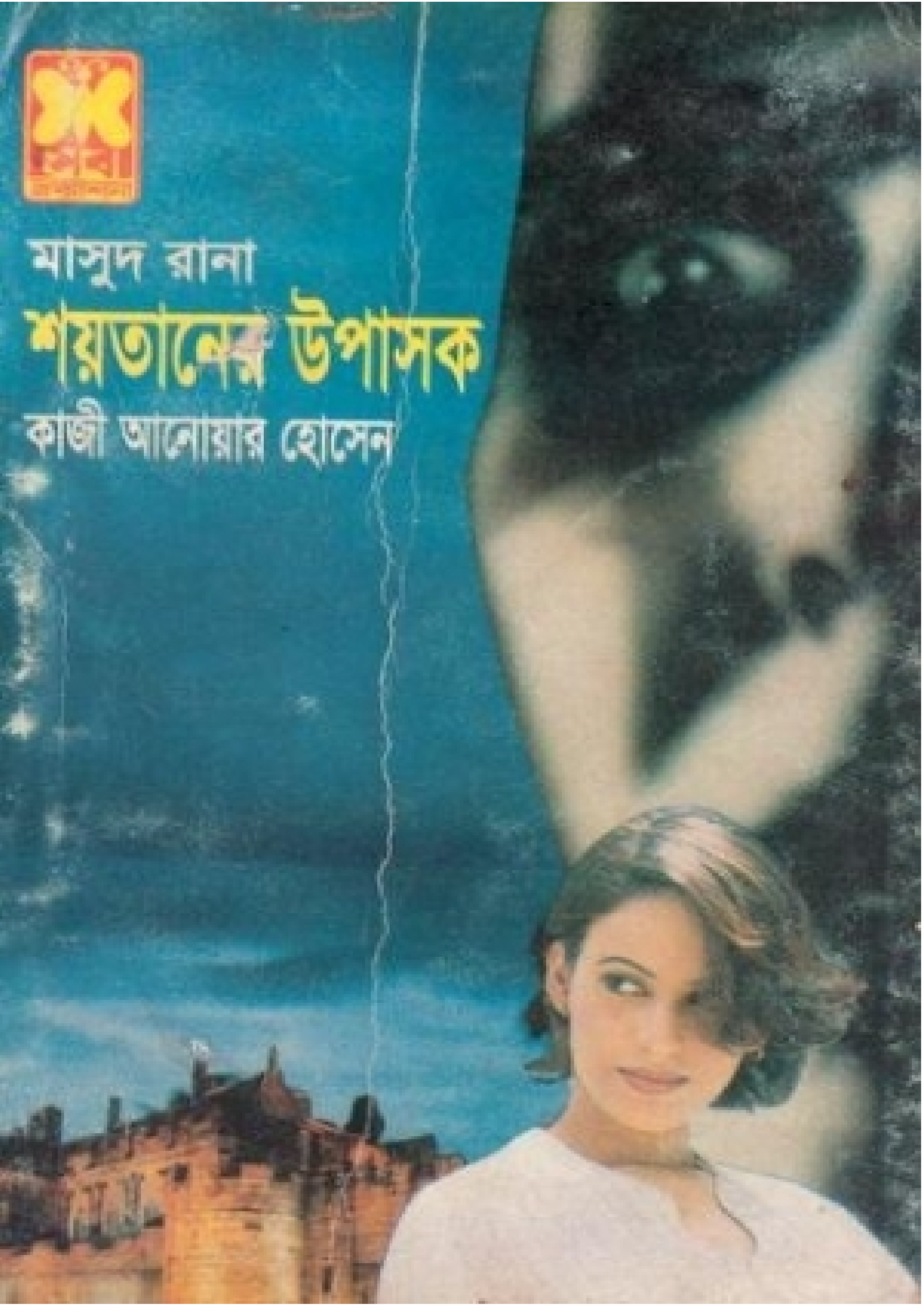

শয়তানের উপাসক

প্রথম প্রকাশ :২০০৩

এক

জায়গাটা রাজধানী ব্যাংকক থেকে কয়েকশো কিলোমিটার পুবে কম্বোডিয়া সীমান্তের কাছাকাছি। নাম প্রাচীনবারি। জাতিসংঘের আর্থিক সহায়তায় এই এলাকার বেশ বড় একটা জায়গা জুড়ে প্রাচীন থাই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খোঁজা হচ্ছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের বড়সড় একটা দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত প্রবীণ জাপানি আর্কিওলজিস্ট ডক্টর ওকিয়ো সামুরাই। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছর আগেকার ব্রোঞ্জ যুগের বিপুল নিদর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা এখানে প্রচুর। কিন্তু বিশ-ত্রিশ ফুট মাটি খুঁড়তেই সবাইকে বিস্ময়ে বিহ্বল করে দিয়ে মাত্র দু'আড়াইশো বছর আগের চক্রি রাজবংশের স্বর্ণমুদ্রা, মূল্যবান হীরে-জহরত, পানপাত্র, ধাতব আসবাব, অলঙ্কার ইত্যাদি বেরিয়ে আসতে শুরু করল। থাই সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন মিউজিয়াম থেকে জানানো হলো, দেহাবশেষ সহ এ-সব মূল্যবান জিনিস-পত্র প্রায় একশো বছর আগে চুরি হয়েছিল। কে চুরি করেছিল, কি উদ্দেশ্যে, কোথায় রেখেছিল, এতদিন এ-সব প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। কি অদ্ভুত খেয়াল, এসব অমূল্য সম্পদ এতদিনে থাই জাতিকে ফিরিয়ে দেয়ার সদয় মর্জি হয়েছে প্রকৃতির।

আরও অনেক প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়ার আশা ত্যাগ করা হয়নি, এলাকার অন্যান্য সাইটে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ এখন আবার পুরোদমে শুরু হয়েছে।

পড়ন্ত বিকেলে তাঁবুর বাইরে বসে কফি খাচ্ছেন প্রফেসর ওকিয়ো সামুরাই। ভদ্রলোক গল্প করছেন থাইল্যান্ডে বেড়াতে আসা পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে কৌতূহলী তথা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সমঝদার এক তরুণ অ্যাডভেঞ্চারারের সঙ্গে। দুনিয়ার তাবৎ মিউজিয়ামই শুধু নয়, অসংখ্য প্রাচীন ধ্বংসাবশেষও দেখা হয়েছে প্রফেসরের। এভাবে ঘুরে বেড়াবার সময় মননশীল ও বিচিত্র চারিত্রিক বৈভবের অধিকারী বহু মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাঁদের মধ্যে এই অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় তরুণ মাসুদ রানা তাঁর মনে একাধারে স্নেহ ও সমীহের বিশেষ একটা আসন দখল করে নিয়েছে। রানাকে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রকৃত বয়স নির্ধারণের নিয়ম শিখিয়েছেন, রানা তাঁকে ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিয়েছে মেক্সিকোর ইউকাটান বা পেরুর পার্বত্য এলাকার ঠিক কোথায় গেলে পাওয়া যাবে আধুনিক সভ্যতার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পড়ে থাকা চার কি পাঁচ হাজার বছর আগেকার নগরসভ্যতা। পরস্পরের সঙ্গ তাঁরা পছন্দ করেন, খবর রাখেন কে কোথায় কী নিয়ে ব্যস্ত, যার পক্ষে সম্ভব হয় তিনি ছুটে আসেন দেখা করতে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রানা জানত প্রফেসর সামুরাই থাইল্যান্ডে কাজ করছেন, তাই ছুটি ও বেড়ানোর শেষ পর্যায়ে আজ বিকেলে চলে এসেছে দেখা করতে।

প্রফেসর সামুরাইকে কি কারণে একটু যেন উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো রানা। প্রশ্ন করতে, 'তেমন কিছু না' বলে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন তিনি। রানাও কোন কৌতূহল প্রকাশ করল না। খানিক পর প্রফেসরের একজন সহ নিজের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। রানার সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় দেয়া হলো। ডক্টর বীরবল প্রফেসর সামুরাইকে বললেন, 'কাল রাতে ছিনতাই হবার পরপরই খবর দেয়া হলো থানায়। অথচ বিশ-বাইশ ঘন্টা কেটে গেল পুলিসের দেখা নেই।'

'হুম।' প্রফেসর ওকিয়ো সামুরাইকে আরেকটু গম্ভীর দেখাল। 'আজ রাতে আমি আপনাদের স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।'

'প্রফেসর সামুরাই,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডক্টর বীরবল বললেন, 'সঙ্গে আজ সকালেই আমি কথা বলেছি। তিনি আমাকে পুলিস চীফের যোগাযোগ করতে বলেন। পুলিস চীফ আমাকে জানিয়েছেন, তিনি এর মধ্যে স্পেশাল ফোর্স পাঠাচ্ছেন। স্পেশাল ফোর্স না আসায় আবার আমি চীফের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। একবার নয়, কয়েকবার লাইনে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আপনি বলতে চাইছেন লবডং চক্রির এতই ক্ষমতা যে...'

ডক্টর বীরবল তিক্ত একটু হেসে বললেন, 'আমি তো আপনাকে কাল বলেছি, লবডং পরিবার শুধু মাফিয়া নয়, নামের সঙ্গে চক্রি যোগ নিজেদেরকে রাজবংশের উত্তরাধিকারী বলে দাবি করে তারা। ওদেরকে ছুঁতে সাহস সত্যি বলতে কারোই নেই।'

'তারমানে অত দামী হীরেটা আমরা উদ্ধার করতে পারব না?' প্রফেসর সামুরাইর চোখে অবিশ্বাস। 'আপনি যা-ই বলুন,' হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া করে তিনি। 'প্রয়োজনে আমি প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য চাইব। ওই হীরেটা ঐতিহ্যের...'

'সাবধান!' হঠাৎ প্রফেসরকে সতর্ক করলেন ডক্টর বীরবল। 'মার্সিডিজটা আজ আবার আসছে!'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে মেইন রোড ছেড়ে মেটো পথে নামতে দেখল লাল গাড়িটাকে। সানগ্লাস খুলে পকেটে রেখে দিল ও, জ্যাকেটের বোতাম খুলে শোল্ডার হোলস্টারের নাগাল পাওয়ার উপায়টা সহজ করে রাখল।

লাল মার্সিডিজ এমন এক জায়গায় হঠাৎ ব্রেক কষে থামল যে, লাল ধুলোর বিশাল একটা মেঘ মিনিট দুয়েকের জন্যে ঢেকে ফেলল তাঁবু, গাড়ি আর তাঁবুর সামনে বসা সবাইকে। ধুলো যখন সরে যেতে শুরু করেছে, ডক্টর বীরবল সিদ্ধান্ত নিলেন নিজের তাঁবুতে ফিরে গিয়ে পুলিসকে ফোন করবেন। ফোল্ডিং চেয়ার ছেড়ে দ্রুত পা চালিয়ে ঢুকে পড়লেন নিজের তাঁবুতে।

মাথা কামানো, পরনে বাদামী রঙের সুট, দু'পাশে দু'জন বডিগার্ডকে নিয়ে এগিয়ে এলো লাল মার্সিডিজের আরোহী।

'থিরু সিরিকিত লবডং-এর বড় ছেলে,' ফিসফিস করলেন ডক্টর সামুরাই 'ওর নাম কাইতি লবডং। চক্রি রাজবংশের যে-সব জিনিসপত্র মাটি খুঁড়ে পাওয়া

গেছে সেগুলো দেখতে এসে এই লোকই বড় একটা হীরে জোর করে কেড়ে নিয়ে গেছে। আজ আবার কি মনে করে এসেছে কে জানে।'

ডক্টর সামুরাইর পাশে, ডক্টর বীরবলের খালি চেয়ারটায় বসল কাইতি লবডং। একজন বডিগার্ড তার পিছনে পজিশন নিল, আরেকজন দাঁড়াল ডক্টর সামুরাইর পিছনে। দু'জনের হিপ হোলস্টার খালি হয়ে গেল, যে-যার পিস্তল বের করে আঙুলের সাহায্যে অনরবত ঘোরাচ্ছে। 'ও-সব সরাও,' ঘর্ঘরে গলায় বলল কাইতি লবডং। তার হাতে ছয় ইঞ্চি ব্লেডের একটা তীক্ষ্ণধার ছুরি বেরিয়ে এলো। 'কেউ যদি স্পর্ধা দেখাবার পর প্রায়শ্চিত্ত না করে, তার চোখ তুলে নেয়ার জন্যে এটাই যথেষ্ট।' রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে প্রফেসর সামুরাইর দিকে তাকাল সে। 'কার এত সাহস হলো যে পুলিস চীফ আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে লবডং চক্রি পরিবারের বিরুদ্ধে ছিনতাইয়ের অভিযোগ করল?'

'দেখি বলে অত বড় একটা হীরা নিয়ে চলে গেলেন আপনারা–,' শুরু করলেন প্রফেসর সামুরাই।

'চলে গেলাম! কোথায়?' কাইতি লবডং যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'ওটা তো আমি শুধু বাবাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। যে প্লেনে গেছি, সেই প্লেনেই ফিরে এসেছি।'

নিজের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন ডক্টর বীরবল। কাইতি লবডঙের শেষ কথাটা শুনে একটু যেন নার্ভাস হয়ে পড়লেন তিনি। 'আপনি ডায়মন্ডটা ফিরিয়ে দিতে এসেছেন?'

'এটা কোন প্রশ্ন হলো!' অভিমানে, আহত বিস্ময়ে কয়েক সেকেন্ড বাকশক্তি হারিয়ে বসে থাকল কাইতি লবডং। 'অবশ্যই ডায়মন্ডটা ফিরিয়ে দিতে এসেছি আমি।' এরপর ছুরিটার ধার পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। 'তবে কথা আছে। আপনারা জানেন, লবডং চক্রি পরিবার প্রাচীন একটা রাজবংশ। এই বংশের কারও সম্পর্কে কেউ দুর্নাম রটালে আমরা তাকে ক্ষমা করি না।'

'বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে একটা ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা ঘটেছে,' ডক্টর বীরবল বললেন। 'হীরে ফিরিয়ে দেয়ার এই যে আপনার সদিচ্ছা, এর জন্যে আর্কিওলজিক্যাল টীমের পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি। এবং পুলিস-চীফ ও মন্ত্রী মহোদয়কে খবর দেয়ার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত...'

তাঁকে থামিয়ে দিল কাইতি লবডং। 'আপনি দুঃখ প্রকাশ করলেই কি প্রাচীন, সম্ভ্রান্ত লবডং চক্রি বংশের দুর্নাম ঘুচবে?'

'ঠিক আছে, যা ঘটেছে তার জন্যে আমরা নাহয় ক্ষমাই চাইব,' বললেন ডক্টর বীরবল।

'ক্ষমা, দুঃখ, কৃতজ্ঞতা–এ-সব তো বায়বীয় ব্যাপার, স্রেফ সাউন্ড, ফাঁপা শব্দ।' কাইতি লবডং হাসল। 'আপনি একজন থাই হয়ে আরেকজন থাই-এর ভাষা বুঝতে পারছেন না, এটা সত্যি লজ্জার বিষয়। আমি ক্ষমা চাওয়ার কথা বলিনি। বলেছি প্রায়শ্চিত্তের কথা।'

'তারমানে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর সামুরাই, রেগে যাওয়ায় সুর অত্যন্ত কঠিন।

'মাটি খুঁড়ে কি পাওয়া গেছে সবাই এখন তা জানে, শুধু একটা বাক্সের কথা ছাড়া,' বলল কাইতি লবডং। 'সবই চক্রি রাজবংশের চুরি যাওয়া সম্পদ। অর্থাৎ এ-সবের বৈধ মালিক চক্রি রাজবংশের শেষ বংশধর হিসেবে আমরাই। তবে ওসব নিয়ে পরে আমরা উপযুক্ত লোকজনের সঙ্গে কথা বলব। এই মুহূর্তে আমার বাবা শুধু ওই বাক্সটা চান।'

'ইমপসিবল! নো! দ্যাট'স রিডিকিউলাস!' ঠিক যেন আর্তনাদ করে উঠলেন প্রফেসর সামুরাই। 'ওটা আমাদেরকে গবেষণা করে দেখতে হবে...'

'তারমানে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি নন আপনি,' বলল কাইতি লবডং। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে। সরে এলো প্রফেসর সামুরাইর সামনে। তার ইঙ্গিতে বডিগার্ড দু'জন পিছন থেকে চেপে ধরল প্রফেসরকে। কাইতি লবডং ছুরির ফলা দিয়ে তাঁর ডান চোখটা তুলে নিতে যাচ্ছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় রানা হতভম্ব। হঠাৎ উপলব্ধি করল, অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলেছে ও। দেরিটা পুষিয়ে নিতে না পারলে সিনিয়র বন্ধু অন্তত একটা চোখ হারাবেন এখুনি।

দুই হাত সামনে বাড়িয়ে মাটিতে ঝাঁপ দিল রানা। হাতের ওপর ভর দিয়ে ডিগবাজি খেল শূন্যে। পা দুটো মাটিতে পৌঁছবার আগেই নাগাল পেয়ে গেল কাইতির। বাতাসে ভাসমান অবস্থাতেই লবডঙের ছুরি ধরা হাতের কব্জিতে শক্ত একটা লাথি মারল। ছুরিটা আধইঞ্চির জন্যে প্রফেসর সামুরাইর চোখ ছুঁতে পারল না, তবে কাইতির হাত থেকে ছিটকে পড়ার আগে কিভাবে যেন উল্টে হয়ে গেল—ক্ষুরের মত ধারাল ফলা ঘ্যাচ করে কেটে নিয়ে গেল তারই ডান হাতের কড়ে আঙুলের তিনভাগের এক ভাগ।

'তুমি থাই হলেও এই আন্তর্জাতিক ভাষাটা আশাকরি বুঝবে।' কাটা আঙুল আরেক হাতে চেপে ধরে ক্যাঙ্গারুর মত লাফাচ্ছে কাইতি লবডং রানাকে ঘিরে, তার সামনাসামনি থাকার জন্যে রানাকেও দ্রুত ঘুরতে হচ্ছে। 'তোমার বডিগার্ডদের পিস্তল রেখে দিয়ে চারদিকে একটু তাকাতে বলো।' বলে তাঁবুগুলোর পিছন দিকটায় হাত তুলল রানা, সেই হাত ঘুরে এলো একটা বৃত্ত তৈরি করে।

দেখা গেল মাটি খোঁড়াখুঁড়ির কাজ ফেলে কয়েকশো শ্রমিক ও আর্কিওলজিক্যাল টীমের প্রায় আশিজন সদস্য চারদিক থেকে ছুটে আসছে সন্দেহ নেই, শুধু পুলিস নয়, ফোনে ওদের সঙ্গেও ডক্টর বীরবল যোগাযোগ করেছিলেন।

দৃশ্যটা দেখে কাইতি লবডঙের চোখ-মুখ হিংস্র হয়ে উঠল। 'এর পরিণতি ভাল হবে না। আজ আমরা চলে যাচ্ছি, তবে এরপর যেদিন ফিরে আসব সেদিন কোন সুযোগ দেয়া হবে না তোমাদের।'

'এক মিনিট,' বলে প্রফেসর সামুরাইর দিকে তাকাল রানা। 'বাক্সটায় কি আছে বলুন তো? ওরা ওটা চাইছে কেন?'

প্রফেসর সামুরাইকে শক্ত পাথর মনে হলো। 'মিস্টার রানা, আমি চাই না এর মধ্যে আপনি জড়িয়ে পড়েন।' কাইতি লবডঙের দিকে তাকালেন তিনি

'তোমরা গুণ্ডা, কিন্তু গুণ্ডাদের আমি ভয় পাই না। ওই বাক্স তোমরা পাবে না। একজন রাজাকে আমি একদল খুনী-বদমাশের হাতে তুলে দিতে পারব না। যাও, যা পার করো গিয়ে!'

'না-না!' দ্রুত বলল রানা, হাবভাবে একটু যেন রসিকতার ছোঁয়া। 'এটা কোন সমাধান হলো না। এটা ওদের দেশ। এ-ও আপনাকে বুঝতে হবে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারের চেয়ে ওদের ক্ষমতা অনেক বেশি।' কাইতির দিকে ফিরল ও। 'তোমার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই। আঙুলটা কাটা পড়েছে তোমার নিজেরই দোষে। বলতে চাইছি, আপত্তি না থাকলে আমাকে তোমার একজন বন্ধু বলে ধরে নিতে পারো। কোথায় ডেলিভারি দিতে হবে বলে যাও, ওই বাক্স আমি নিজে পৌঁছে দেব। তবে ওর বদলে হীরাটা ফেরত দিতে হবে তোমাদের।'

বডিগার্ডদের একজন কাইতির আঙুলে আঁট করে রুমাল জড়িয়ে রক্ত বন্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ব্যথায় উহ্-আহ্ করছে কাইতি।

ডক্টর বীরবল শ্রমিক ও সহকারীদের নিরাপদ দূরত্বে থামিয়ে দিয়েছেন, সবাইকে বোঝাচ্ছেন—কেউ চায় না এখানে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটুক।

'এর মধ্যে কোন চালাকি নেই তো?' দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ব্যথা সহ্য করবার ফাঁকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে জানতে চাইল কাইতি।

'রাজা রামা এক-এর দিব্যি, কোনও চালাকি নেই,' বলল রানা। 'বাক্সটা অবশ্যই তোমরা পাবে। প্রশ্ন হলো—কোথায় নিতে চাও, কখন?'

'আগামীকাল, রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে। ব্যাংককের পশ্চিমে, ছোট্ট শহর কাঞ্চনবারিতে।'

'কাঞ্চনবারি তো ট্যুরিস্ট স্পট, ক্যাসিনো টাউন, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওখানেই আমাদের হেডকোয়ার্টার,' জবাব দিল কাইতি লবডং। 'লবডং এয়ারপোর্ট থেকে লবডং রেন্ট-আ-কার নিয়ে সোজা লবডং নাইটলাইফে চলে যেয়ো—ওটা একটা নাইটক্লাব।'

'এয়ারপোর্ট, রোড ট্র্যান্সপোর্ট ব্যবস্থা, ক্লাব—গোটা শহরটাই তোমাদের নাকি?'

রানার দিকে একটা আঙুল তাক করে এত যন্ত্রণার মধ্যেও জোর করে হাসল কাইতি, একজন বডিগার্ডকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ও একটা শহরের কথা বলছে! জানে না এরকম আরও কয়টা শহরের মালিক আমরা!'

কাইতির কাঁধে একটা হাত রেখে লাল মার্সিডিজ পর্যন্ত এগিয়ে দিল রানা, যেন কতদিনের জান-ই দোস্ত। কাইতি লবডংকে নিয়ে লাল মার্সিডিজ চলে যাবার পর নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসল রানা। 'এবার আমাকে সবকথা খুলে বলুন, প্রফেসর সামুরাই।'

প্রফেসর আগের চেয়েও উদ্বিগ্ন ও গম্ভীর। 'কাজটা আপনি ভাল করলেন না, মিস্টার রানা। আমার পরিচিত একজন থাই ওয়েটার আছে ওখানে, বিরু সাম্পান, তার মুখে শুনেছি লবডং নাইটলাইফে ওরা মানুষ খুন করে লাশ পুঁতে

ফেললেও...'

'প্রফেসর, প্লীজ!'

'ঠিক আছে, এতই যখন ইনসিস্ট করছেন, শুনুন তাহলে...'

দুই

কাঞ্চনবারি। লবডং নাইটলাইফ।

দেশী-বিদেশী ভদ্রলোক, সুন্দরী রমণী, সুবেশী র‍্যাকমেইলার, ভয়াবহ গডফাদার—সবাই এখানে এসেছে রাতটাকে উপভোগ করতে। খুঁজলে ভদ্রলোক মুসলমানকে মদ খেতে বা জুয়া খেলতে দেখা যাবে। মুখে 'অহিংস পরমধর্ম' বলতে বলতেই দেখা যাবে বৌদ্ধরা হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। আর গরু এখানে হিন্দু খদ্দেরদের প্রিয় আইটেম। খ্রিস্টানদের কথা না বলাই ভাল। নিজেদের জন্যে 'নিষিদ্ধ' বলে কোন তালিকাই ওরা রাখেনি।

এখানকার স্থানীয় এবং ইউরোপ থেকে আমদানী করা সিগারেট-গার্লস এতই সুন্দর আর স্বল্পবসনা যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে মিস ইউনিভার্স কমপিটিশনে দাঁড় করিয়ে দিলে টিকে যাবার ভাল সম্ভাবনা আছে।

নাইটক্লাবটার এক দিকের দেয়াল ঘেঁষে ছোট ছোট কেবিন, দোতলায়ও তাই। ওগুলোর ভাড়া প্রতি ঘণ্টার জন্যে পাঁচশো ডলার। ছোট হলেও, প্রতি কেবিনে একটা করে বিছানা আছে। বিশেষ করে ধনী লোকের বখাটে ছেলেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের বান্ধবীদের নিয়ে কাটায় ওখানে। বার পিছন দিকে প্রবেশপথের কাছাকাছি, একপাশে কিচেনের দরজা। ওই দরজার আরেক পাশে, একটু উঁচু হয়ে রয়েছে ব্যান্ডস্ট্যান্ড, তার সামনে ডান্সফ্লোর ও স্টেজ।

স্টেজের দু'পাশে দুই দানব, খোদাই করা কাঠের স্ট্যাচু—প্রাচীন দুই থাই ওঅরলর্ড, বসে আছে নিজেদের স্বর্ণসিংহাসনে, হাতে বাগিয়ে ধরা দু'খানা সোনার তলোয়ার, ভাবটা যেন তাদের হুকুমেই উপস্থিত সবাই আনন্দ-ফুর্তিতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

স্টেজ থেকে যে দানবটাকে বাম দিকে দেখা যায়, ওটার মাথার ওপর একজোড়া মোটা কর্ড থেকে প্রকাণ্ড একটা পিতলের ঘণ্টা ঝুলছে। ঘণ্টার গায়ে সবুজ পাহাড় এমবস করা, সেই পাহাড়ে রয়েছে লাল-হলুদ রঙা একটা ড্রাগন।

স্টেজের সামনেও একটা ড্রাগনের হাঁ করা মুখ দেখা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে সেই মুখ থেকে সুগন্ধি সাদা ধোঁয়ার মেঘ বেরিয়ে আসছে। মেঘ সরে যেতে শমিকে দেখা গেল। শমি অর্থাৎ শমিতা বেনেগাল শুধু থাইল্যান্ড বা ভারত নয়, গোটা এশিয়ার শ্রেষ্ঠ রূপসীদের একজন। এখানে, থাইল্যান্ডে ওর উপস্থিতির জন্যে কোন আবেগকে যদি দায়ী করতে হয় তো সেটা হলো অভিমান। একা শুধু ওর নয়, মিডিয়ারও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মিস ইন্ডিয়া না হবার কোন কারণ ছিল না ওর, অথচ রানার্স আপও হতে পারেনি শমিতা। সেই অভিমানেই

ব্যাংককে বেড়াতে এসে লবডং নাইটলাইফে নাচের চাকরি নিয়ে মাস পাঁচেক হলো দেশের কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে। তবে ওর একমাত্র ভাই নতুন দিল্লির একটা বোর্ডিংহাউসে থেকে লেখা পড়া করছে, ইদানীং তাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

অন্যান্যদিনের মত শমিতার আজকের নাচটা তেমন উত্তেজক হলো না। দর্শকদের অনুরোধে সাড়া না দিয়ে আজ সে ভারতীয় ধ্রুপদী নাচের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলল সীতার বনবাস, এবং পরবর্তীতে তার অগ্নিপরীক্ষার কাহিনী। মিউযিশিয়ানরাও করুণ রস ফুটিয়ে তুলল দক্ষতার সঙ্গে। নাচ শেষ হতে দর্শকরা হাততালি দিল। সামনের সারিতে একটা বড় টেবিল নিয়ে বসা তিনজন স্বাস্থ্যবান লোক সবিনয়ে মাথা নত করে সম্মান জানাল শমিতাকে, না হেসেও তারা নিজেদের ওপরের ঠোঁট কিভাবে যেন উঁচু করে তুলতে সমর্থ হলো। এরাই থিরু সিরিকিত লবডং আর তার দুই সুযোগ্য পুত্র। সন্দেহ নেই, ছদ্মবেশী তিন বজ্জাত, ভাবল শমিতা। একটা কথা মনে পড়তে হঠাৎ নিজের অজান্তে শিউরে উঠল সে। ওয়েটার বিরু সাম্পান আড়াল থেকে শুনেছে, আজ এখানে এক ভদ্রলোককে নাকি খুন করা হবে।

চোখাচোখি হতে সিরিকিত লবডঙের উদ্দেশে হাসল শমিতা, তারপর একটা চোখ টিপল। এই থাই মাফিয়া ডনের গুডবুকে থাকার জন্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ-সব করতে হয় ওকে। সিরিকিত অক্ষম, কাজেই তার সঙ্গে প্রেম করার ভান করতে কোন সমস্যা নেই, লাভ হলো ছেলে দুটোর লোলুপদৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করা যাচ্ছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশংসা করল সিরিকিত, কিন্তু পরমুহূর্তেই কি যেন একটা চোখে পড়তে তার চেহারায় কালো ছায়া পড়ল। ছুটে স্টেজ থেকে বেরিয়ে দোতলায় উঠছিল শমিতা, দৃষ্টি অনুসরণ করে মাফিয়া ডনের অসন্তুষ্টির কারণটা বোঝার চেষ্টা করল।

কারণটা হলো একজন পুরুষমানুষ। শমিতার মনে হলো, জীবনে কখনও না কখনও এই রকম একজন পুরুষের সঙ্গে দুনিয়ার প্রতিটি নারীরই একবার দেখা হওয়া উচিত, তা না হলে জন্মটাই বুঝি বৃথা হয়ে যায়। লোকটা ক্লাবে ঢুকছে। তার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসার ভঙ্গিটা এত সহজ, সুন্দর ও সাবলীল, এই নাইটক্লাবের প্রতিটি ইঞ্চি যেন চেনে, যেন এখানে আরও বহুবার এসেছে। অথচ শমিতা তাকে এই প্রথম দেখছে। সাদা একটা ডিনার জ্যাকেট পরেছে সে, বাটন হোলে লাল একটা ছোট্ট গোলাপ। কালো ট্রাউজার, ভেস্ট, বো টাই আর জুতো। কি এক অজানা আশঙ্কায় শমিতার শরীর শিরশির করে উঠল। লোকটা কি পুলিস? নাকি বড় কোন গ্যাঙ লীডার? বিরু সাম্পান আড়াল থেকে একেই খুন করার কথা শোনেনি তো?

দোতলায় উঠে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে শমিতা, লোকটাকে সিঁড়ির নিচে পৌঁছতে দেখল—ওয়েটার বিরু সাম্পান তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

প্রথমে এলিভেটর থেকে বেরুল রানা, তারপর সিঁড়ি বেয়ে লবডং নাইটলাইফে

নামল। একবার চোখ বুলিয়েই বুঝে নিল ও, স্টেজ শো এইমাত্র শেষ হলো, ডান্স ফ্লোর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে নাচিয়ে মেয়েগুলোও। থিরু সিরিকিতের টেবিলে চোখ পড়ল, চিনতে পারল কাইতি লবডংকে। ঠিক এই সময় একজন ওয়েটার ওর সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটার বয়স বেশি নয়, তবে চুল উঠে যাওয়ায় কপালটা অস্বাভাবিক চওড়া দেখাচ্ছে। লোকটা বর্ণসংকর-বাপ ভারতীয়, মা চীনা। এরই নাম বিরু সাম্পান। রানার উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সে, এত নিচু স্বরে কথা বলল যে আর কেউ শুনতে পেল না। 'সাবধান!'

অন্যমনস্কতার ভান করে মাথা ঝাঁকাল রানা, অলস পায়ে লবডংদের টেবিলের দিকে এগোচ্ছে। শমিতার সম্মানে দর্শকদের সঙ্গে ক্লাব মালিক আর তার দু'ছেলেও চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। করতালি থামল, সেই সঙ্গে আবার আসন গ্রহণ করল তিন লবডং। কাইতির কড়ে আঙুলের সাদা ব্যান্ডেজটা রানার দৃষ্টি এড়াল না।

'মাসুদ রানা? প্রফেসর ওকিয়ো সামুরাইর বন্ধু?'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'থিরু সিরিকিত লবডং?'

সিরিকিতের বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে। প্রচুর চর্বচোষ্য গলাধঃকরণের ফলে চোয়াল থেকে শুরু করে পিঠ ও পেটে কয়েক স্তর চর্বি জমলেও একনজরেই বোঝা যায়, চর্বির ভেতরটা লোহার মত শক্ত—এ যেন গিরগিটির মাংস। কালো সিল্ক ব্রোকেডের ডিনার জ্যাকেট পরেছে, শার্টটাও কালো, তবে টাইটা সাদা। তার চোখের গড়নটাই এমন, যেন অসম্ভব ভারী পাতা দুটো সারাক্ষণ নেমে আসতে চাইছে, খুলে রাখতে খুব কষ্ট হচ্ছে তার। বাঁ হাতের আঙুলে চক্রি রাজবংশের প্রতীক-চিহ্ন খোদাই করা একটা আঙটি পরেছে।

সিরিকিতের বাঁয়ে বসেছে ছোট ছেলে জাইতি লবডং, বাপেরই তরুণ সংস্করণ—শক্ত-সমর্থ, গম্ভীর, বদমেজাজী ও নিষ্ঠুর। সিরিকিতের ডানে বসেছে কাইতি লবডং। সে যথেষ্ট লম্বা। আজ তার গলায় সাদা একটা রুমাল বাঁধা।

সিরিকিত থাই ভাষায় বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি শালা এত বোকা? জেনেশুনে যমের ঘরে পা দিলে?'

দু'ছেলে বাপের কথা শুনে হেসে উঠল।

'তুই বানচোত আমার চেয়ে বেশি বোকা,' ওই একই ভাষায় জবাব দিল রানা। 'তা না হলে শত্রুকে কেউ আগে থাকতে সাবধান করে দেয়?'

টেবিলে বসা তিন লবডং চুপ মেরে গেল। চোখ ভর্তি অ্যাসিড নিয়ে রানার দিকে তাকাল সিরিকিত। 'আমাদেরকে তুমি আগে কেন বুঝতে দাওনি যে থাই ভাষা তোমার জানা আছে?' জিজ্ঞেস করল সে, ভেবেও দেখছে না এ কেমন উদ্ভট আবদার তার।

নির্লিপ্ত রানা জবাব দিল, 'আগ বাড়িয়ে কোন কথা আমি বলে বেড়াই না।'

দুজন বডিগার্ড হাজির হলো, রানাকে দ্রুত সার্চ করে আবার সরে গেল চোখের আড়ালে। ব্যাপারটা রানার পছন্দ হলো না, তবে জানত এ-ধরনের কিছু ঘটবে। সিরিকিতের উল্টোদিকে বসল ও।

সঙ্গে সঙ্গে একজন ওয়েটার চলে এলো। বড় একটা ডিশে করে প্রচুর

ক্যাভিয়ার নিয়ে এসেছে, সঙ্গে বরফ ভরা বালতিতে শ্যাম্পেন আর স্প্রাইট-এর বোতল। ডিশটা টেবিলের মাঝখানে রাখা হলো, বালতিটা সিরিকিতের পাশে।

'আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্যে ক্যাভিয়ার ছাড়াও শ্যাম্পেন আর স্প্রাইটের অর্ডার দিয়েছি আমি,' সহাস্যে, সবিনয়ে বলল সিরিকিত। 'আমাদের মেহমান বন্ধু একজন খাঁটি মুসলমান হলেও হতে পারেন, তাই তাকে শ্যাম্পেন খেতে বলাটা হয়তো অপরাধ হয়ে যাবে।' আশ্চর্য এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে রানার চোখ-মুখ পরীক্ষা করছে সে। 'কথাটা তাহলে সত্যি। প্রফেসর ওকিয়ো সামুরাই রামা এক-কে খুঁজে পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ, প্রফেসর তো তাই বলছেন। তাঁর ভাষায়, এ হলো প্রায় কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবার মত একটা ব্যাপার। ইনিই নাকি চক্রি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।'

'তাঁর রক্তই বইছে আমাদের শরীরে,' বলল সিরিকিত লবডং, আঙুল তুলে নিজেকে ও দু'ছেলেকে দেখাল। 'সতেরোশো বিরাশি থেকে আঠারোশো নয় সাল পর্যন্ত শ্যামদেশ শাসন করেছেন। রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করার পর প্রথমেই তিনি নদীর ওপারের থোন বারি থেকে সাম্রাজ্যের রাজধানী ব্যাংককে নিয়ে আসেন, তারপর তৈরি করেন গ্র্যান্ড প্যালেস।'

'তা এরকম গর্ব ও গৌরব করার মত পূর্ব-পুরুষ চুরি হলেন কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সেটা একশো বা তারও বেশি বছর আগের কথা,' বিষয়টা এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করল সিরিকিত। 'আমার তখন জন্ম হয়নি। হারানোটা বড় কথা নয়, ফিরে পাওয়াটা মিরাকল—আমাদের সময়ে ঘটেছে।'

কাইতি লবডং তার আহত হাতটা টেবিলের ওপর রাখল।

ছেলের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে সিরিকিত রানাকে বলল, 'তুমি আমার ছেলেকে অপমান করেছ।'

রানা হেলান দিল চেয়ারে। 'না, আসলে আমি তোমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছি। আমি ওকে প্রফেসরের কোন ক্ষতি করতে দিইনি; ক্ষতিটা হয়ে গেলে ওকে খুন না করে আমার কোন উপায় থাকত না।'

'সিরিকিত রানার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, একটা কেউটে সাপ যেন বেজির দিকে তাকিয়ে আছে। 'কথা অনেক হয়েছে। এবার আমি চক্রি রাজবংশের প্রথম রাজা রামা এক-কে চাই।' টেবিলের মাঝখানে রয়েছে গোল আকৃতির রিভলভিং ট্রে, তাতে ভাট-এর একটা বান্ডিল রাখল সে, তারপর ট্রেটা ঘোরাতেই টাকার বান্ডিলটা রানার সামনে চলে এলো।

হাত দিয়ে ছুঁয়ে বান্ডিলটার মাপ নিল রানা, তারপর ট্রে ঘুরিয়ে টাকাটা ফেরত পাঠাল সিরিকিতের দিকে, মাথা নেড়ে বলল, 'এতে আমার আসা-যাওয়ার খরচও উঠবে না, লবডং। আমার ধারণা ছিল আমি একজন সৎ ক্রিমিনালের সঙ্গে লেনদেন করতে বসেছি।'

কাইতি ও জাইতি লবডং রাগে গরগর করে উঠল। জাইতি প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ সাদা দস্তানা পরা পেলব একটা হাত পড়ল সিরিকিতের কাঁধে। ওই হাতের কোমল, মসৃণ ও মাখন রঙা ঢাল বেয়ে রানার দৃষ্টি উঠে গেল থাই মাফিয়া ডনের পিছনে দাঁড়ানো অপরূপ এক মুখশ্রীর দিকে। সে-ও সরাসরি তাকাল রানার দিকে। 'মিস্টার লবডং, আপনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন না?' নরম গলা, যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কোন কোকিলের সুর।

হাতের ঝাপটায় জাইতিকে বসবার নির্দেশ দিল সিরিকিত। 'মিস্টার মাসুদ রানা, এ হলো শমি–শমিতা বেনেগাল। শমি, ও হলো বিখ্যাত আর্কিওলজিস্ট প্রফেসর সামুরাইর বন্ধু।'

ঘুরে এদিকে চলে আসছে শমিতা, সৌজন্যবশত দাঁড়াল রানা। হ্যান্ডশেক করার সময় পরস্পরকে বোঝার একটা ঝটপট চেষ্টা থাকল। রানার চেহারা পছন্দ হলো শমিতার। চেহারায় পৌরুষ আছে, একই সঙ্গে আছে মায়া; আবার এ-ও মনে হলো দুর্যোগকবলিত একটা শিশু, আদর আর যত্ন তার খুবই দরকার। শমিতার কোমল অন্তরে কি যেন একটা উথলে উঠতে চাইল। সৌন্দর্যপিপাসু রানার অনুভূতি হলো, এই রূপ ও অভিজাত ব্যক্তিত্বকে এখানে নিশ্চয়ই বন্দী করে রাখা হয়েছে। তার হাতের দস্তানা যেন বলতে চাইছে, 'আমি বহুকিছু সামলাই, কিন্তু ছুঁই না।' পারফিউমটা অত্যন্ত দামী, ড্রেসটা সামনে যথেষ্ট উঁচু হলেও, পিছনে খুব–খুবই–নিচু করে কাটা। রানা এটার অর্থ করল, মেয়েটা ঠাণ্ডা প্রশান্তি বয়ে আনে, রেখে যায় মধুর স্মৃতি। শমিতা সিরিকিতের এখানে আছে। রানার কাছে এটা বিপদসংকেত।

'আপনিও কি একজন আর্কিওলজিস্ট?' রানার হাতটা ছেড়ে দিয়ে তির্যক দৃষ্টি হেনে জানতে চাইল শমিতা। মনে মনে শাসাল–খবরদার, মিথ্যে কথা বলবে না! তোমাকে আমার আইনের লোক মনে হচ্ছে। 'মাটি খোঁড়েন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'মাটি না, ওটা ছাড়া প্রায় সবই খুঁড়ি আমি।'

নিশ্চয়ই ইন্টারপোল অফিসার!–ভাবল শমিতা।

বসল ওরা। ওদের সংক্ষিপ্ত আলাপে বাদ সাধল সিরিকিত লবডং। 'আমার পক্ষ থেকে রামা এক-কে খুঁজে বের করেছেন প্রফেসর সামুরাই। তিনি তাঁর প্রতিনিধি রানাকে পাঠিয়েছেন আমাকে ওটা ডেলিভারি দেয়ার জন্যে। কই, রানা?'

রানা উত্তর দিতে যাবে, এই সময় প্রথমে অনুভব করল, তারপর দেখতে পেল পিস্তলটা। কাইতির অক্ষত হাতে রয়েছে ওটা, সরাসরি ওর দিকে তাক করা। পিস্তলের ভাষা রানা শুনতে রাজি নয়, তাই কাছাকাছি একটা ট্রে থেকে জোড়া দাঁড়াসহ বাঁকা একটা ফর্ক তুলে নিল, ভান করল শমিতার কথা মন দিয়ে শুনছে।

'আচ্ছা, এই রামা এক-টা কে?' সকৌতুকে প্রশ্ন করল মেয়েটা, আসন্ন বিস্ফোরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তবে পরমুহূর্তেই সচেতন হতে বাধ্য করা হলো তাকে। নরম শরীরটা কাছে টেনে টেনে নিল রানা, ফর্কটা ঠেকাল পাঁজরের নিচে।

মুহূর্তের জন্যে দম আটকাল শমিতা। মনের ভেতর কে যেন পুনরাবৃত্তি

করছে: জানতাম! জানতাম! জানতাম! তারপর সিরিকিতের উদ্দেশে নরম গলায় বলল, 'মিস্টার লবডং, ও আমার পেটে একটা ফর্ক ঠেকিয়ে রেখেছে।'

জাইতিকে রানা হাসিমুখে বলল, 'পিস্তলটা সরাও।' শমিতার পেটে ফর্কের চাপ আরও একটু বাড়াল।

শমিতা অনুভব করল তার চামড়ায় গভীর দাগ ফেলে দিচ্ছে ফর্কের দাঁড়া দুটো। ভয় গোপন করার জন্যে কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ আনবার চেষ্টা করল সে। 'মিস্টার লবডং, শুনতে পাচ্ছেন, ও আমার পেটে একটা ফর্ক ধরেছে!' না, আইনের লোক হলে ফর্কটা সত্যি সত্যি ব্যবহার করবে না–ভাবছে সে–তবে পুরুষমানুষ আর তাদের খেলনা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলাও যায় না।

সিরিকিত তার ছেলের দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাল। কাইতি সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলল পিস্তলটা।

ফর্কে আরও একটু চাপ দিল রানা। 'এবার আমার পরামর্শ শুনতে বলি। তোমার ছেলে যে কথা দিয়ে এসেছে সেটা রাখো, সিরিকিত, তা না হলে···ভয়ানক কিছু ঘটে যাবে।' তারপর, শমিতার কানের কাছে মুখ নামিয়ে। 'ঠিক বলছি না?'

'হ্যাঁ,' হিসহিস নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল শমিতা।

'ওকে বলো,' নির্দেশ দিল রানা।

'যা চায় দিয়ে দিন ওকে,' সিরিকিতকে বলল শমিতা, 'প্লিজ!'

কথা না বলে পকেট থেকে একটা পাউচ বের করল সিরিকিত, টার্নটেবিলে রেখে ঘোরাল, জিনিসটা পৌঁছে গেল রানা ও শমিতার সামনে। চোখ দিয়ে শমিতাকে ইশারা করল রানা, শমিতা পাউচটা তুলে ট্রের ওপর খালি করল–কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা।

পাষাণ হয়ে গেল রানার মুখ। 'হীরেটা, সিরিকিত। কথা হয়েছে হীরেটার সঙ্গে বিনিময় হবে।'

হাসল সিরিকিত, কাঁধ ঝাঁকিয়ে পরাজয় মেনে নেয়ার ভঙ্গি করল, সুটের আরেক পকেট থেকে রুপোর একটা কৌটা বের করে টার্নটেবিলে রাখল।

ঠিক যে মুহূর্তে কৌটার ওপর চোখ পড়ল রানার, সঙ্গে সঙ্গে সাদা পাউডার ভর্তি ছোট্ট একটা শিশি পাশে রাখা গ্লাসে ঢেলে দিল কাইতি–শুধু ওই গ্লাসটাতেই স্প্রাইট ঢালা হয়েছে। তারপর টার্নটেবিল আবার যখন ঘুরতে শুরু করল, পাশ থেকে তুলে গ্লাসটা তাতে রাখল সে–রুপোর কৌটা আর স্বর্ণমুদ্রাগুলোর মাঝখানে।

জিনিসগুলো ওদের সামনে পৌঁছাতে রুপোর বাক্সটা খুলল শমিতা। ভেতরে রয়েছে জগতের সবচেয়ে বড় আর শ্রেষ্ঠ হীরেগুলোর একটা। 'ওহ্, মিস্টার সিরিকিত!' সশব্দে দম ফেলল সে।

হীরে হলো তার আনন্দের উৎস, লোভী সত্তার প্রলম্বিত ক্রন্দন। হীরে শক্ত, কঠিন পৌরুষের প্রতিনিধিত্ব করে। হীরে স্বচ্ছ, ধারণ করে প্রতিটি রঙ। আবার হীরে বিলাসবহুল ভবিষ্যৎও–এরকম একটা ডায়মন্ড তার সারাজীবনের চাহিদা তো মেটাবেই, এই নরক থেকে চিরকালের জন্যে মুক্তিও বয়ে আনবে।

ফর্কটা টেবিলে গেঁথে রত্নটা কৌটা থেকে বের করল রানা, ঠেলে সরিয়ে দিল শমিকে ওর নিজের চেয়ারের দিকে। ধপ করে বসে পড়ে ঠোঁট কামড়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল শমি। কুঁচকে রয়েছে সুন্দর ভুরু জোড়া। 'আশ্চর্য তো!'

তার দিকে না তাকিয়ে হীরেটা পরীক্ষা করল রানা। প্রফেসর সামুরাইর দেয়া বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

'এইবার,' হিসহিস করল সিরিকিত। 'এবার আমাকে রামা-এক এনে দাও।'

একটা হাত তুলে বিরু সাম্পানের উদ্দেশে নাড়ল রানা, নাইটক্লাবে ঢোকার পর যে ওয়েটারটা ওকে সাবধান করে দিয়েছিল। ইঙ্গিত পেয়ে সামনে চলে এলো সে, তার বাঁ হাতের ওপর লিনেনের একটা ন্যাপকিন ঝুলছে, ডান হাতে একটা ট্রে। ট্রের মাঝখানে সবুজ জেড পাথরের বাক্স।

শমির রাগ এখন পরিণত হয়েছে কৌতূহলে। টাকা, স্বর্ণমুদ্রা, প্রকাণ্ড হীরে, হুমকি, খুনের আশঙ্কা···এখন আবার অতি ক্ষুদ্র অথচ অতি মূল্যবান না জানি কি! 'এই রামা এক-টা কে ছাই?' কৌতূহল বেলুনের মত ফেটে গেল, নিস্তব্ধতার ভেতর যেন পটকা ফাটল টেবিলে।

বিরু সাম্পানের ট্রে থেকে ছোট বাক্সটা তুলে নিল রানা, সাবধানে নামিয়ে রাখল টার্নটেবিলে, তারপর সিরিকিতের দিকে ঘোরাল ওটা। 'এই নাও,' বলল ও। 'এর ভেতর আছেন তিনি।'

সিরিকিতের দিকে এগোচ্ছে, বাক্সটাকে অনুসরণ করছে শমির দৃষ্টি। 'নিশ্চয়ই বামুনের চেয়েও ছোট হবেন!' বিড়বিড় করছে। 'লিলিপুটিয়ান?'

বাক্সটা নিজের দিকে টেনে নিল সিরিকিত। খুলল না, প্রথমে বাক্সটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরীক্ষা করছে। তার ছেলেরাও ঝুঁকে পড়ে বাক্সের চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখছে। তারপর তিন বাপ-বেটা পরস্পরের দিকে সন্তুষ্ট চোখে একবার তাকাল। সিরিকিতের শান্ত, ভাব-গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, প্রায় যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে, 'এই পবিত্র কফিনের ভেতর রয়েছে চক্রি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামা এক-এর দেহভস্ম।'

সবাই শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলছে দেখে রানাও স্প্রাইটের গ্লাসটা তুলে নিল। একযোগে চুমুক দিল সবাই। 'মহামহিম চক্রি রাজা রামা এক-কে স্বজনদের মধ্যে স্বাগতম!' বলে ঢক ঢক করে গ্লাসের বরফ কুচি মেশানো স্প্রাইট খেয়ে ফেলল রানা।

দেহভস্ম? শমি ভাবছে। ছাই? এই নিয়ে সাতকাণ্ড রামায়ণ? শুধুই ছাই? হতাশাটা এত প্রবল, দুর্বল আর অসুন্দর বোধ করল সে। আয়না ইত্যাদি বের করে মেকআপ নিচ্ছে।

সিরিকিতের ঠোঁটে ধারাল হাসি, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'এবার, উজবুক কাঁহিকে, হীরেটা তুমি আমাকে ফেরত দেবে।'

যেন হঠাৎ করেই কামরাটা একটু গরম লাগল রানার। গলার কাছে শার্টের বোতামটা খুলে ফেলল। 'তুমি নতুন কোন কৌতুক বানিয়েছ, নাকি আসলে

কালা হয়ে যাচ্ছি আমি?'

ছোট একটা নীল শিশি উঁচু করে দেখাল সিরিকিত লবডং।

আয়না থেকে চোখ তুলতেই সেটা দেখতে পেল শমি। ভাবল, আরও রত্ন? 'কি ওটা?' জানতে চাইল সে।

'অ্যান্টিডোট!' কর্কশ গলা সিরিকিতের। 'প্রতিষেধক!'

'প্রতিষেধক?' চোখে-মুখে সন্দেহ নিয়ে সাবধানে জানতে চাইল রানা। 'কিসের প্রতিষেধক?' অকস্মাৎ উপলব্ধি করল, শত্রুর সাধা পানীয় খেয়ে জীবনের সম্ভবত সবচেয়ে বড় ভুলটা করে বসেছে ও।

'এইমাত্র যে বিষটা খেয়েছ, তার।' বত্রিশপাটি হলুদ দাঁত বের করে হাসছে সিরিকিত লবডং।

উদ্বেগে নাকি বিষক্রিয়ায়, বলা মুশকিল, শমির পেটের ভেতরটা মোচড় দিল। 'বিষ!' আতংকে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না। 'মিস্টার লবডং, এ আপনি কি করছেন? আমি আপনার এখানে কাজ করি!' তবে এখন থেকে আর নয়, পেটের মোচড়টা সে-কথাই যেন বলতে চাইছে।

গ্লাসের ভেতর হাত ঢুকিয়ে তলায় আঙুলের ডগা ঘষল রানা, করকরে কি যেন ঠেকল।

'বিষটা দ্রুত কাজ করে, রানা,' রুমাল দিয়ে ঠোঁটের কোণ মুছে মনে করিয়ে দিল সিরিকিত। মুখে হাসি ধরে না।

হীরেটা টেবিলে রাখল রানা তারপর হাতটা লম্বা করল। 'ওটা দাও, সিরিকিত।'

প্রায় ছোঁ দিয়ে হীরেটা তুলে নিল কাইতি। বিচ্ছুরিত আলোর ঝিলিক দেখল, সন্তুষ্টির হাসি ফুটল সারা মুখে। টার্নটেবিলে রেখে বাবার দিকে ঘোরাল সেটা। শমিকে পাশ কাটাচ্ছে, সে-ও দেখবার জন্যে ট্রে থেকে তুলে নিল হীরক খণ্ডটা। এত বড় ডায়মন্ড ছোঁয়া তো দূরের কথা, চোখের দেখাও দেখেনি কখনও। শমি হীরেটার কোন খুঁত খুঁজে পাচ্ছে না। তার হাতের তালুতে পাথরটা যেন গুনগুন করছে।

ডায়মন্ডের দিকে এই মুহূর্তে খেয়াল নেই সিরিকিতের, সে প্রায় সম্মোহিত দৃষ্টিতে জেড পাথরের বাক্সটার ভেতর তাকিয়ে আছে। 'অবশেষে। অবশেষে আমাদের রাজাধিরাজ রামা এক-এর ছাই আমার হাতে পৌঁছল।'

রানা এখন শুধু অধৈর্য নয়; বেপরোয়া হয়ে ওঠার জরুরী তাগাদা অনুভব করছে। ওর চোখের সামনে রাশি রাশি হলুদ ফুটকি নাচতে শুরু করেছে। 'প্রতিষেধক, সিরিকিত!'

সিরিকিত ওকে গ্রাহ্য করছে না। ভান করছে ওর কথা শুনতে পাচ্ছে না।

রানা বুঝতে পারছে, এভাবে হবে না। বিকল্প উপায় প্রতি মুহূর্তে কমে যাচ্ছে। টেবিলে গাঁথা ফর্কটা হ্যাঁচকা টানে তুলে আবার শমির পাঁজরে চেপে ধরল ও। 'সিরিকিত!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'লবডং!' শমির গলায় চাপা আর্তনাদ।

সিরিকিত, কাইতি ও জাইতি–তিন বাপ-বেটা শুধু হাসছে আর হাসছে।

'মেয়েটা তোমাকে দান করলাম,' বলল বাপ। 'ওকে নিয়ে তুমি যা খুশি তাই করতে পারো। আমি আরেকটা যোগাড় করে নেব।'

সিরিকিতের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল শমি, যেন তার পুরানো একটা সন্দেহ এইমাত্র সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। 'মিস্টার না ছাই! তুমি লবডং ওয়োরের বাচ্চা!'

হঠাৎ এক পা সামনে এগিয়ে এলো বিরু সাম্পান। 'প্লীজ!' সিরিকিতের দিকে তাকিয়ে হাসছে সে। টেবিলের সবাই ওরা দেখল জিনিসটা। তার ট্রে ধরা হাতের নিচে রয়েছে, রেস্তোরাঁর আর সবার চোখের আড়ালে। একটা পিস্তল। সরাসরি মাফিয়া ডন সিরিকিত লবডঙের দিকে তাক করা।

'এখানকার সার্ভিস তো দেখছি সত্যি খুব ভাল,' মন্তব্য করল রানা।

'বিরু আসলে ওয়েটার কিনা আমার সন্দেহ আছে, ও বোধহয় ছদ্মবেশী পুলিস!' সবাই উত্তেজনায় টান-টান হয়ে আছে, ফর্কটা এখনও পাঁজরে লেগে থাকায় শমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ডাইভ দিয়ে কোন টেবিলের তলায় লুকাবে কিনা।

'বিরু সাম্পান পুলিস কিনা জানি না,' বলল রানা। 'তবে মানুষ হিসেবে সে আদর্শ। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। সে যাক, খেলাটা এখনও শেষ হয়নি, সিরিকিত। প্রতিষেধকটা দাও।'

রানা হাত বাড়িয়েছে, পাশের টেবিলে জোরালো একটা পটকা ফাটল। আসলে পটকা নয়, মদ খেয়ে চুর এক আমেরিকান এইমাত্র শ্যাম্পেনের একটা বোতল খুলল—উথলানো ফেনা সে তার হাসাহাসি করছে গার্লফ্রেন্ডের গায়ে স্প্রে করছে। ওয়েটাররা আরও বোতল খুলছে, পটকা ফাটার মত আরও শব্দ হলো, বাড়ল হাসির আওয়াজ আর ফেনার স্প্রে। সবাই সেদিকেই তাকিয়ে আছে।

রানা নিজের টেবিলে মনোযোগ ফেরাল। ওর স্বস্তিবোধ ক্রমশ বাড়ছে, অথচ লক্ষ করল পাশে দাঁড়ানো বিরু সাম্পানকে খুবই ম্লান দেখাচ্ছে। 'বিরু, কি ব্যাপার—' শুরু করল ও, কিন্তু শেষ করবার আগেই দেখল লোকটা কাত হয়ে টেবিলের ওপর ঢলে পড়ছে।

এতক্ষণে কাইতির হাতের পিস্তলটাকে একটা ন্যাপকিনের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে দেখল রানা, মাজল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

'সার!' হাঁপাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো বিরু সাম্পান।

সে পড়ে যাচ্ছে, খপ করে ধরে নিজের চেয়ারে তাকে বসিয়ে দিল রানা। 'ভয় পেয়ো না, বিরু,' নিচু গলায়, দৃঢ়কণ্ঠে অভয় দিল। 'এখান থেকে ঠিকই তোমাকে বের করে নিয়ে যাব আমি...'

'ধন্যবাদ। আপনি সত্যিই ভাল মানুষ,' এইটুকু বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল বিরু সাম্পান। তার মাথাটা ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল রানা। ঘামে ওর সারা শরীর ভিজে যাচ্ছে। বাতাসের অভাবটাও ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে। শ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন মুখ খুলে।

ওর অবস্থা লক্ষ করে আনন্দ ধরে রাখতে পারছে না সিরিকিত। উরুতে চাপড় মেরে হাসছে সে। 'এত মন খারাপ কোরো না, রানা। অচিরে তুমিও ওর

সঙ্গে মিলিত হবে।'

রানার পা দুটো হঠাৎ করে যেন রাবার হয়ে গেল। ভারসাম্য রক্ষার জন্যে পিছন দিকে হোঁচট খাচ্ছে ও।

কাইতি লবডং খিক-খিক করে হাসল। নিজের কামানো মাথায় হাত বুলিয়ে সকৌতুকে জানতে চাইল, 'মাল বোধহয় একটু বেশি টানা হয়ে গেছে, তাই না, রানা?'

রানা এখনও হোঁচট খেয়ে পিছু হটছে, পাশের টেবিলটার সঙ্গে ধাক্কা খেলো। ওই টেবিলের হতচকিত লোকগুলোর চেহারা দেখে কাইতি-জাইতি দুইভাই গলা ছেড়ে হেসে উঠল। অসুস্থ রানা প্রচণ্ড রাগে মাতাল আমেরিকানটাকে দু'হাতে ধরে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল, পরমুহূর্তে ধাক্কা খেলো একজন ওয়েটারের সঙ্গে। ওয়েটার আরেকটা টেবিলের দিকে চাকা লাগানো ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, তাতে রোস্ট করা প্রকাণ্ড একটা হাঁস রয়েছে, হাঁসের পাশে পড়ে রয়েছে হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি হাতল লাগানো একটা ছুরি। ছুরিটা ছোঁ দিয়ে তুলল রানা, বন করে ঘুরেই ছুঁড়ে মারল কাইতির দিকে।

কাইতির বুকের মাঝখানে আইভরি বাদে ছুরির সবটুকু ঢুকে গেল সাঁৎ করে।

অনিশ্চিত ভাবটা কাটতে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। ওদের টেবিলের আশপাশে যারা আছে, সবাই বোবা হয়ে গেছে, বোধহয় নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে। তারপর সবকিছু একসঙ্গে ঘটতে শুরু করল।

প্রথমে তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল শমির। তার দেখাদেখি পাশের টেবিলের দুই তরুণী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে গলা ফাটাবার প্রতিযোগিতা শুরু করল। রেস্তোরাঁর বাকি অংশে শুরু হলো হৈ-হট্টগোলের বিস্ফোরণ। লোকজন দিক-বিদিক ছুটছে। টেবিল উল্টে পড়ছে। গ্লাস আর প্লেট চুরমার হচ্ছে। প্রতিষেধকের ছোট্ট নীল শিশিটা নাগালের মধ্যে পাওয়ার জন্যে টেবিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা, কিন্তু চকচকে সারফেসের ওপর পিছলে গেল ওটা, গড়িয়ে কার্পেটে পড়ল। কার্পেটে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে রানা, সামনে পড়ল সিরিকিতের মুখ। কনুই চালিয়ে তার বোঁচা নাকটা একেবারে থেঁতলে দিল রানা। লোকটা ব্যথায় গোঙাচ্ছে, তার ছেলে জাইতি পিছন থেকে একহাতে রানার গলাটা পেঁচিয়ে চাপ বাড়াচ্ছে। আরেক কনুই পিছন দিকে চালিয়ে জাইতির পাঁজরের একটা হাড় ভাঙল রানা। কিন্তু তারপরেও মুক্তি নেই, লবডংদের একজন ভাড়াটে গুণ্ডা মাথার চুল ধরে টেনে খাড়া করল ওকে, একই সঙ্গে জুতোর ডগার এক খোঁচায় প্রতিষেধকের শিশিটাকে গড়িয়ে দিল অন্যদিকে। পাঁজর চেপে ধরে ব্যথায় গোঙাচ্ছে জাইতি, তার পিস্তল টেবিলের তলায় পড়ে আছে।

এই পর্যায়ে শমির মাথায় অনেক কথাই খেলছে। সিরিকিত স্রেফ একটা জানোয়ার, কাজেই তার কাছ থেকে পালাবার সুযোগ ওর হাতছাড়া করা উচিত হবে না। মাসুদ রানা মূর্তিমান বিপদ, তাতে কোন সন্দেহ নেই; তবে সে যদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে সুযোগের সন্ধানে থাকে, হীরেটা নিয়ে পালানো তার পক্ষে

অসম্ভব কোন কাজ নয়।

নিলেই যখন নেয়া হয়, হাত বাড়িয়ে হীরেটা নিল শমি। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে রানা আর এক গুণ্ডা ধস্তাধস্তি করছিল, হঠাৎ তারা দু'জনেই ছিটকে এসে ধাক্কা খেলো তার সঙ্গে। হীরেটা শমির হাত থেকে পড়ে গেল। ওটার যেন পাখা গজিয়েছে, ড্রপ খেয়ে পৌঁছে গেল ডান্স ফ্লোরে। 'ইউ ফুল!' ঝাল ঝাড়ল শমি নিজের ও রানার ওপর, তারপর পিছু নিল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটার।

এই সময় ব্যান্ড বেজে উঠল; মিউযিসিয়ানরা শমিকে দেখে উজ্জীবিত। সিরিকিতের বডিগার্ডকে নিয়ে কার্পেটে গড়াগড়ি খাচ্ছে রানা। লোকটা ওর চোয়ালে ঘুসি মারতে চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে এলো, অন্ধের মত পাল্টা ঘুসি চালাতে সেটা এক সিগারেট-গার্লের পেটে লাগল। ভারসাম্য হারিয়ে সে তার জিনিস-পত্র নিয়ে ওদের ওপরই আছাড় খেলো। রানাকে টেবিল থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল লোকটা। নিচে নয়, সচল একটা ডিনার ট্রলির ওপর পড়ল রানা। দিক সামান্য বদলে ব্যান্ডস্ট্যান্ড-এর দিকে এগোচ্ছে ট্রলি।

মুখে বাতাস লাগতে রানার আচ্ছন্ন ভাবটা একটু যেন কাটছে। বিষক্রিয়াজনিত ঘামে কপালটা বরফের মত ঠাণ্ডা লাগল। ট্রলিটা যে-সব লোকজনকে পাশ কাটাচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের চেহারায় মনে হলো ফাটল ধরেছে। নীল শিশিটা মেঝেতে দেখতে পেল ও—নাকি স্রেফ কল্পনা? কল্পনা হোক বা বাস্তব, ওকে নিয়ে শিশিটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে ট্রলি।

যাত্রার ইতি ঘটল ব্যান্ডস্ট্যান্ড-এর সঙ্গে ট্রলিটা ধাক্কা খাওয়ায়। নিচে নেমে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, আবার চোখে পড়ল শিশিটা। তবে ও একা নয়, সিরিকিতের বডিগার্ডও দেখতে পেয়েছে ওটা। ব্যান্ডস্ট্যান্ড থেকে বড়সড় ডাবল বেইস-টা তুলে নিয়ে সবেগে ঘোরাল ও, গুণ্ডার খুলি ফাটিয়ে দিয়েই ডাইভ দিল শিশিটার দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন লাথি দিল ওটায়। পরমুহূর্তে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে উঁচু হলো ও, দেখল একই ভঙ্গিতে ওর মুখোমুখি অবস্থান করছে শমি।

'অ্যান্টিডোট!' হাঁপাচ্ছে রানা।

'ডায়মন্ড!' শমির জবাব।

হীরেটা ওর হাতের পাশেই, দেখতে পেল রানা। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কারও জুতোর ডগায় লেগে একডজন পায়ের ভেতর ঢুকে পড়ল সেটা।

'যাহ্!' বলে ক্রল করে ওটার পিছু নিল শমি। রানা ঘুরে উল্টো দিকে রওনা হলো।

এতক্ষণে লোকজনের ভিড় ঠেলে ঘণ্টা বাজাতে সমর্থ হলো সিরিকিত, ঘণ্টার আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার কর্কশ গর্জন। প্রায় চোখের পলকে একদল পোষা গুণ্ডা ছুটে এলো, নির্দেশের অপেক্ষায় এক লাইনে দাঁড়াল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে চাইনিজ কুড়াল।

ব্যান্ড বেজে উঠল, বেইস ছাড়াই। ড্রাগনের মুখ থেকে ডান্স ফ্লোরে বেরিয়ে এলো এক ডজন নর্তকী। নাইটক্লাবের ম্যানেজাররা পার্টি জমিয়ে তোলার দায়িত্ব পালনে এতটুকু অবহেলা করতে রাজি নয়।

রানার এদিকে জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা। সিরিকিতের গুণ্ডাদের আসতে দেখে রক্ত অবশ্য বেশ গরম হয়ে উঠল ওর। ইতোমধ্যে দাঁড়িয়েছে ও, পিছু হটে ব্যান্ডস্ট্যান্ড-এর কাছে ফিরে এলো।

তিনজন গুণ্ডা ওকে লক্ষ্য করে কুড়াল ছুঁড়ল। ঝট করে একটা স্ট্যাচুর আড়ালে লুকাল রানা। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটা সিম্‌বল্ বা করতাল ধরল ও, ছুঁড়ে দিল চাইনিজ কুড়ালধারী চতুর্থ গুণ্ডার দিকে। সিম্‌বলের কিনারা খুলিতে লাগায় গুরুতর আহত হলো লোকটা, জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল ওখানেই। পাশেই ছিল বরফের টুকরো ভর্তি একটা বালতি, সেটা উল্টে গেল। ওল্টাল হীরেটার ওপর। বরফের টুকরোর ভেতর থেকে হীরেটাকে খুঁজে পাওয়া এখন স্রেফ কপালের ব্যাপার। গুঙিয়ে উঠে ওগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শমি। পাগলের মত এলোপাতাড়ি খুঁজছে। পেল ঠিকই; তবে হীরের বদলে নীল শিশিটা।

স্টেজে দাঁড়িয়ে শমিকে শিশিটা তুলতে দেখল রানা। 'ওখান থেকে নড়বে না!' চেঁচিয়ে উঠল। 'প্লীজ!'

ওদের দু'জোড়া চোখ এক হলো। শমির এটা সিদ্ধান্ত নেয়ার মুহূর্ত। কে এই লোক? তার জীবনে ওর আগমন ঘটেছে মাত্র দশ মিনিট আগে। মুখে কিছু বলেনি, শুধু দৃষ্টিতে প্রশংসা ঝরতে দেখা গেছে। অথচ কাজটা কি করল? তার পেটে ফর্ক চেপে ধরল। যদিও দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হীরেটা ছুঁতে বাধা দেয়নি ওকে। তবে এই লোকের কারণেই চাকরিটা গেছে তার। সেটা অবশ্য কোন ক্ষতিই নয়। এই মুহূর্তে বিপজ্জনক অথচ অদ্ভুত আকর্ষণীয় লোকটার জীবন বা মরণ তার হাতে। বিনিময়ে ওর আছে একজোড়া কালো টলটলে জলভরা দীঘি–মানে, মায়া ভরা দুটো চোখ।

শিশিটা ড্রেসের সামনে, বুকের মাঝখানে রেখে দিল শমি। যাই ঘটুক, হীরেটা তাকে খুঁজে পেতে হবে। বরফের টুকরোগুলোর ওপর আরেকবার হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, চোখ মেলে জাইতি দেখল তার পিস্তলটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাতে রানাকেও দেখতে পেল। পাঁজরের ভাঙা হাড় ভয়ানক কষ্ট দিচ্ছে, তারপরও অতি কষ্টে পিস্তলটা তুলে কামরার আরেক দিকে লক্ষ্যস্থির করছে সে।

সময়মতই তাকে দেখতে পেল রানা। পিছু হটে স্টেজের এক পাশে সরে এলো, ওখানে ঝুলে থাকা রিলিজ রোপ-টা ধরে টান দিল দ্রুত। পরমুহূর্তে, অলসভঙ্গিতে, সিলিং থেকে নেমে আসতে শুরু করল–শত শত নয়, হাজার হাজার–রঙচঙে বেলুন। বেলুনের পর্দার আড়ালে টার্গেট হারিয়ে ফেলল জাইতি লবডং।

রানা ছুটল একটু আগে যেদিকটায় শমিকে দেখা গেছে। পৌঁছে দেখল শমি নেই, তার বদলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দুই গুণ্ডা। একজন ওকে লক্ষ্য করে কারাতের কোপ চালাল, সেটা এড়িয়ে লোকটার সোলার প্লেক্সাসে প্রচণ্ড এক খোঁচা মারল ও। এক খোঁচাতেই বেহুঁশ। দ্বিতীয় লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল খেপে ওঠা এক ওয়েটারের গায়ে। লোকটার মাথায় একটা গ্লাস ভাঙল ওয়েটার।

বিষ রানাকে খেয়ে ফেলছে। শরীরে কাঁপুনি অনুভব করল। পেটের যা কিছু আছে সব যেন গোল পাকিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে হলো হারিয়ে এই কষ্ট আর ভোগান্তি থেকে রেহাই নেয়। না! না! যেভাবে শমিকে খুঁজে পেতে হবে। শিশিটা ওর দরকার।

ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি ঢালল মুখে। একটু যেন সুস্থ বোধ করল রেস্তোরাঁর পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আরও চারজন গুণ্ডাকে ভেতরে ঢুকতে দেখল ও।

জাইতি লবঙং ব্যথা ও রাগে অন্ধ হয়ে আছে। সে তার ভাইয়ের খুনে বদলা নিতে চায়, কিন্তু হাতটা এত কাঁপছে যে ঠিকমত লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না। হঠাৎ খেয়াল করল, তাদের এক পোষা গুণ্ডার হাতে সাব-মেশিন গান রয়েছে। বদ্ধ উন্মাদের মত সিঁড়ি বেয়ে ছুটল সে, লোকটার হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিল, ছুটোছুটি আর হৈ-হট্টগোলের মধ্যে ঢুকে চিৎকার করছে, 'কোথায় সে? খুন করব আমি শালাকে!'

মেশিন গান দেখে লোকজন যে যেদিকে পারে ছুটল। বেলুনগুলো ইতোমধ্যে বেশিরভাগই মেঝেতে নেমে এসেছে। এক মুহূর্ত পরেই জাইতি ও রানা দেখতে পেল পরস্পরকে। জাইতি গুলি করতে যাচ্ছে, ব্যালকনির কারনিসে নেমে প্রকাণ্ড ঝুলন্ত ঘণ্টাটার আড়ালে আশ্রয় নিল রানা। এক ঝাঁক বুলেট ব্যালকনির রেইলিং ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। লোকজন 'বাঁচাও! বাঁচাও!' করে চিৎকার করছে, ডাইভ দিয়ে পড়ছে মেঝেতে বেলুন ফাটিয়ে।

প্রথম এক পশলা বুলেট বৃষ্টি থামতে জোড়া দানব মূর্তির একটাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা, দু'ধারি তলোয়ারটা কেড়ে নিল ওটার হাত থেকে, তারপর এক কোপে কেটে ফেলল জোড়া কর্ড, যেগুলো প্রকাণ্ড ঘণ্টাটাকে সিলিঙের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে। বিকট শব্দে মেঝেতে খসে পড়ল সেটা।

ঘণ্টার পিছনে আশ্রয় নিয়ে ঝাঁক-ঝাঁক বুলেট থেকে গা বাঁচাচ্ছে রানা। তবে ওখানে পাঁচ-সাত সেকেন্ডের বেশি থাকল না, ওটার আড়াল নিয়ে ক্রল করে এগোচ্ছে শমির দিকে। শমি এখনও পাগলিনীর মত এলোপাতাড়ি এক রাশ টুকরো বরফের ভেতর খুঁজছে হীরেটা।

মেশিন গানের বিরতিহীন বুলেট বৃষ্টি একসময়ে প্রকাণ্ড ঘণ্টাটাকে গড়িয়ে দিল। ওটার গতি বেড়ে ওঠায় লুকিয়ে থাকার জন্যে ছুটতে হচ্ছে রানাকে।

বুলেট ও ঘণ্টা গড়ানোর বিকট আওয়াজ শুনে মুখ তুলতেই আতংকে নীল হয়ে গেল শমি। প্রকাণ্ড ঘণ্টাটা সরাসরি তার দিকে ছুটে আসছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে তার একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, তাকে নিয়ে ঘণ্টার আগে আগে ছুটল, কাভার এখনও নষ্ট হয়নি। সামনে একটা কাঁচের দেয়াল, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু। শমিকে নিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াতে ঘণ্টাটা কাঁচ ভেঙে বেরিয়ে গেল রেস্তোরাঁর বাইরে। ওটার পিছু নিয়ে ছুটল রানা, শমির হাত এখনও ছাড়েনি। 'আমি যাব না–,' চিৎকার করল সে। তবে বৃথাই। রানা লাফ দেয়ায় তাকেও লাফ দিতে হলো। ঘণ্টার তৈরি ফাঁক গলে দশ ফুট নিচে একটা ঢালু টাইলের ছাদে পড়ল ওরা, তারপর কিনারা থেকে খসে আবার

শূন্যে–এভাবে আরও দশ ফুট নেমে বাঁশের তৈরি সানশেড-এ পড়ল, সেখান থেকে–অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি–একটা মার্সিডিজ কনভার্টিবল-এর ব্যাক সীটে। সরাসরি দালানটার সামনে পার্ক করতে বলে রেখেছিল রানা, গিল্টি মিয়া ঠিক তাই করেছে। তবে এ গাড়ি সেই গাড়ি নয়। রেন্ট-আ-কার থেকে রানা ভাড়া করেছিল একটা ক্যাডিলাক।

ঝটপট সীটের ওপর উঠে বসল শমি, বেঁচে থাকায় যারপর নাই বিস্মিত ও হতবিহ্বল। সে তাকিয়ে আছে বয়স্ক অথচ ছোট্ট একটা সরল মুখের দিকে। লোকটার চোখ দুটো এত নিষ্পাপ, শমি প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়ল। সামনের সীট থেকে ঘাড় বাঁকা করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে লোকটা। মাথায় একটা সুতি ক্যাপ।

'এ যে দেকচি রাজকন্যে গো!' গিল্টি মিয়ার উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'তা সিসটার-ইন-ল, মনে হচ্চে আকাশ থেকে পড়লেন?'

'গাড়ি ছাড়ো, গিল্টি মিয়া!' বলল রানা, সীটের ওপর ধীরে-ধীরে উঠে বসছে। 'আমরা খুব বিপদের মধ্যে আছি!'

'দেকো দেকি কাণ্ড! আগে বলবেন তো, সার! শক্ত হয়ে বসুন তাহালে। দেকুন ক্যামন উড়িয়ে লিয়ে যাই!' মাথার ক্যাপটা উল্টো করে সিধে হয়ে বসল গিল্টি মিয়া, এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল মার্সিডিজ।

তিন

ছুটি পেয়ে থাইল্যান্ডে রানা বেড়াতেই এসেছে, তবে গিল্টি মিয়াকে সঙ্গে করে আনতেই হয়েছে। হঠাৎ করে সে একশো একটা অসুখ বাধিয়ে বসেছে, আর প্রতিটি রোগ এমনই মারাত্মক যে দ্রুত উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা না হলে তার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। পেটের দু'পাশ আর পিছনটা ব্যথা করে, অর্থাৎ দুটো কিডনিই প্রায় অকেজো; বুক ধড়ফড় করে, হাঁপায়, চিনচিনে ব্যথা হয়, তারমানে হার্টে অন্তত গোটা চারেক ব্লক তৈরি হয়েছে, কোনটাই সেভেনটি-ফাইভ পার্সেন্টের কম নয়; মাঝে-মধ্যে মাথা কাজ করে না, হঠাৎ হঠাৎ চোখে অন্ধকার বা ঝাপসা দেখে, এ-সব লক্ষণ বলে দিচ্ছে তার ব্রেন হেমারিজ হতে যাচ্ছে। প্রতিটি রোগের ডায়াগনোসিস গিল্টি মিয়া নিজেই করেছে, কারণ খবরের কাগজ পড়ে তার ধারণা হয়েছে, দেশের ডাক্তাররা চিকিৎসা করবেন কি, তাঁরা তো রোগীর রোগই ধরতে পারেন না। এ-সব কথা রানাকে বিশদ জানাবার সময় এ-কথাও বলতে ভুলল না যে সে জানে 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে', এবং মরতে তার নাকি তেমন কোন আপত্তিও নেই, শুধু বুক ঠেলে কান্না উঠে আসে যখন ভাবে যে সে তার 'সার'-কে আর দেখতে পাবে না, আর রাঙার মা'র হাতের অপূর্ব রান্না মাঝেমধ্যে কপালে যা জোটে সেটা থেকে তাকে চিরকালের জন্যে বঞ্চিত হতে হবে।

সংক্ষেপে, তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার সব চেষ্টাই রানার ব্যর্থ হলো। তার একই জেদ–ব্যাংককে যে বড় একটা হসপিটাল আছে, সেখানে তার চিকিৎসা হতে হবে। স্বভাবতই এরপর আসা-যাওয়া, থাকা ও চিকিৎসার খরচ প্রসঙ্গ উঠল। মজার বিষয় হলো, প্রসঙ্গটা রানা তোলেনি। গিল্টি মিয়া নিজেই ব্যাখ্যা করল কিভাবে সে এ-সব সমস্যার সমাধান করেছে।

প্রথমেই সে এক তাড়া মার্কিন ডলার রাখল রানার সামনে টেবিলের ওপর। 'গুনে দেকুন। একানে তিন হাজার ডলার আচে। এতে যদি না হয়, ফের আমাকে হপ্তা দুয়েক এয়ারপোর্টে হাত সাফাইয়ের কাজ করতে হবে।'

গিল্টি মিয়ার দুঃসাহস দেখে রানা প্রথমে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আবার পকেট মারা ধরেছ?'

'দেকুন, সার, মিচে কতা বলে কুনো লাব নেই। সত্যি কতা হলো গে, পকেট কাটাটা আমি বোদয় মায়ের পেট থেকেই শিকে এয়েচি। এ শালার বদ অভ্যেস না আমি ছাড়তে পেরেচি, না ছাড়তে পারব–আপনি দেকে লিয়েন।'

'কিন্তু তুমি না তওবা করেছিলে? আমাকেও তো কথা দিয়েছিলে যে আর কোন দিন পকেট মারবে না।'

দাঁত দিয়ে জিভ কাটল গিল্টি মিয়া, দু'হাত দিয়ে কানও ধরল। 'আপনাকে দেয়া কতা কি আমি ভাঙতে পারি–তাহলে যে আমার দোজকবাস হবে। আসলে, সার, স্বভাবটা বদলায়নি, তবে নীতিটা বদলে লিয়েচি।'

'মানে?'

'মাঝেসাঝে কাজ করি, সার, মাঝেসাঝে। যার পকেট কাটি তার এক কানাকড়িও ক্ষতি হয় না। সব আবার তাকেই ফিরিয়ে দিই। বলি, ওই ওকানে কুড়িয়ে পেলুম গো, দেকো তো এটা তোমার কিনা। ওই ব্যাটা তো খুশিতে বাগ বাগ। আমি তখন জুলজুল করে শুধু তাকিয়ে থাকি। একনও এমন কাউকে পেলাম না যে দু'একশো টাকা বকশিশ না দিল। কিন্তু, সার, বিদেশী সাহেবদের কতা একদমই আলাদা। তেনারা দুশো-পাঁচশো ডলারকে স্রেফ খোলামকুচি মনে করে দিয়ে দেন।'

'এটাও একটা অন্যায় পেশার মধ্যে পড়ে,' তাকে বলল রানা। 'তোমার এই তিন হাজার ডলার বৈধ রোজগার নয়।'

গিল্টি মিয়ার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। 'আপনি বলচেন?'

'হ্যাঁ, বলছি।'

'তাহালে আপনি বোধয় এ-কতাও বলবেন যে এই টাকায় চিকিৎসা করালে আমার অসুক সারবে না?'

'না, তা বলব না। অবৈধ টাকার ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে আর বৈধ টাকার আছে উপকার করার ক্ষমতা, এমন কথা বিশ্বাস করার কোন কারণ দেখি না। তুমি অবৈধ রোজগার করবে না নিজের কাছে ছোট না হবার জন্যে, মানুষ হিসেবে উন্নত থাকার জন্যে।'

'কিন্তু সার, উন্নত মানুষ হতে গিয়ে যদি জানটাই দিয়ে দিতে হয়, তাহালে…'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'আমার বিশ্বাস, তুমি শুধু শুধু আতংকে ভুগছ; আসলে তোমার সিরিয়াস কোন অসুখ হয়নি। তবু, মনে ভয় যখন একবার ঢুকেছে সেটা তাড়ানো দরকার। আমি তো ব্যাংককে যাচ্ছিই, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। খরচপাতি কিছুই লাগবে না, সব আমার।'

রানার উদারতার পরিচয় আগেও অনেকবার পেয়েছে গিল্টি মিয়া, কাজেই কথাটা শুনে যতটা না সে অবাক হলো তারচেয়ে বেশি হলো কৃতজ্ঞতায় অভিভূত।

শেষ পর্যন্ত রানার কথাই সত্যি প্রমাণিত হলো। থাইল্যান্ডের সবচেয়ে নামকরা হাসপাতালের কমপ্লিট চেকআপ করার পর দেখা গেল কঠিন কোন, কোন রোগই নেই গিল্টি মিয়ার। তবে সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, এই ভয় তার মন থেকে দূর করার জন্যে ডাক্তাররা 'প্লাসীবো' দিলেন। এক হপ্তা পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেয়ার পর সম্পূর্ণ 'রোগমুক্ত' হয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো গিল্টি মিয়া। আজ সকালের দিকে রানার কাছ থেকে ক্যাডিলাকটা চেয়ে নেয় সে। ব্যাংককের উত্তরে লোনথাবারিতে এক জ্ঞাতিভাই চাকরি করে, তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। রানা তাকে প্লেনের টিকিট কাটতে টাকা দেয়–নিজের জন্যে ব্যাংকক টু নতুন দিল্লি, কারণ এখনও ওর ছুটি শেষ হয়নি; গিল্টি মিয়ার জন্যে ব্যাংকক টু ঢাকা। কাঞ্চনবারিতে অন্য কোন এয়ারলাইন ব্যবসা করতে পারে না, তাই গিল্টি মিয়াকে লবডং এয়ারলাইন্সের টিকিটই কাটতে বলা হয়েছে। রানার শেষ নির্দেশ ছিল, ক্যাডিলাক নিয়ে সে যেন লবডং নাইটলাইফের সামনে উপস্থিত থাকে, ভোর হবার ঠিক এক ঘণ্টা আগে।

সুযোগ ছিল, তাই লবডং রেন্ট-আ-কার থেকে গাড়ি ভাড়া করেনি রানা, করেছে লালুভাই প্রসাদ অ্যান্ড কোম্পানির একটা ক্যাডিলাক। আর গিল্টি মিয়ার জন্যে সেটাই হলো কাল।

পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি রেখে প্লেনের টিকিট কাটতে ঢুকল সে টার্মিন্যাল ভবনের লাগোয়া একটা দালানে, কাঁধে ঝুলছে রানার একটা লেদার ব্যাগ। এখানে এক উটকো ঝামেলায় পড়তে হলো। দিল্লি ফ্লাইট আছে, সকাল ছ'টায়, কিন্তু সেটা কার্গো ফ্লাইট; মুরগী আর মুরগীর ডিম যাবে–কোন প্যাসেঞ্জার নেয়া হবে না। যখন অনেক অনুরোধ-উপরোধেও কাজ হলো না, তখন বাধ্য হয়ে সেই পুরানো টেকনিক ব্যবহার করতে হলো তাকে। ট্র্যাভেল এজেন্সির ম্যানেজারকে তার টাকাভর্তি মানিব্যাগ ফেরত দিল গিল্টি মিয়া। ভদ্রলোক তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে পাইলটকে ডেকে নির্দেশ দিল, 'ইনি সাধু ব্যক্তি, বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে দিল্লি যাওয়া প্রয়োজন। যেভাবে হোক একটা ব্যবস্থা করবে।'

গিল্টি মিয়া তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি কিন্তু একা নই।'

'হ্যাঁ, উনি একা নন,' বলে নিজের কাজে চলে গেলেন ম্যানেজার।

পাইলটের সঙ্গে কথা পাকা করে দালানটা থেকে বেরুচ্ছে গিলটি মিয়া দেখল তার ক্যাডিলাক গাড়ি নিয়ে এক লোক পালাচ্ছে। পার্কিং লটে আরও অনেক গাড়ি ছিল, বেশিরভাগই লবডং কোম্পানির ট্যাক্সি। একদিকে গাড়ি চুরি

হচ্ছে, আরেকদিকে পাটখড়ির মত রোগা ও ছোটখাট এক লোক [illegible] চেহারা নিয়ে নিষ্ফল ও অক্ষম আক্রোশে তড়পাচ্ছে, এ-সব দেখে খ্যাক [illegible] কাশির মত আওয়াজ করে চীনা ও খাই ড্রাইভাররা হাসছে। ক্যাডিলাক [illegible] বাইরে চলে যাচ্ছে দেখেও গিল্টি মিয়া তাদের সাহায্য চাইল না [illegible] লোকগুলোর আত্মবিশ্বাস এত বেশি, কেন কি ঘটেছে তা বেশ রসিয়ে [illegible] স্বেচ্ছায় নিজেরাই ব্যাখ্যা করল। লবডং কোম্পানি একচেটিয়া ব্যবসায় [illegible] তাই সুযোগ পেলেই লালুভাই প্রসাদ কোম্পানির গাড়ি রাস্তা থেকে [illegible] নিজেদের গ্যারেজে নিয়ে যায় তারা। গ্যারেজটা কয়েক বিঘা জায়গার [illegible] অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি-সজ্জিত। যে-কোন গাড়ির রঙ বদলানো, এঞ্জিনের [illegible] তুলে ফেলে নতুন নম্বর লাগানো, সরকারী সীল-ছাপ্পড় সহ বু-বুক ইত্যাদি [illegible] করতে সময় লাগে মাত্র কয়েক ঘণ্টা। পুলিসকে মাসোহারা দেয়া হয়, [illegible] অভিযোগ করে কোন লাভ নেই। এই হলো ঠিকানা…, সে গিয়ে দেখতে পারে কথাগুলো সত্যি কিনা। তবে মার খেয়ে মরে গেলে তাদেরকে কিন্তু দায়ী করে যাবে না।

এ-সব কথা শোনার ফাঁকে গিল্টি মিয়া দেখল, এক ভদ্রলোক একটা মোটরসাইকেল চালিয়ে টার্মিন্যাল ভবনের সামনে এসে থামলেন। সীটের ওপর সুতি ক্যাপটা খুলে রেখে ভবনের ভেতর ঢুকলেন তিনি। শয়তান ড্রাইভারদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মোটরসাইকেলটার দিকে এগোল গিল্টি মিয়া।

ঠিকানা ধরে বিশাল গ্যারেজটা খুঁজে বের করতে গিল্টি মিয়ার কোন অসুবিধে হলো না। রাস্তার ধারে মোটরসাইকেল থামিয়ে খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। ভেতরে ডজন ডজন গাড়ি দেখা যাচ্ছে। কিছু খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছে, কিছু বিশাল টিন শেডের ভেতর। প্রচুর ড্রামও দেখা গেল, ডিজেল ও পেট্রল ভরা। একটা র‍্যাম্পে ক্যাডিলাকটাকেও দেখল সে। আশ্চর্য, রঙ বদলানোর কাজ এরই মধ্যে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চারদিকে লোকজন কম নয়, তবে তাদের মধ্যে দারোয়ান বা গার্ড বলে কাউকে মনে হলো না। নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে এরা এতই নিশ্চিত যে সিকিউরিটির প্রায় কোন ব্যবস্থা রাখারই প্রয়োজন বোধ করেনি।

অনেক দেখেশুনে নীলরঙের একটা মার্সিডিজ কনভার্টিবল পছন্দ করল গিল্টি মিয়া। গাড়িটা এত সহজে নিয়ে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এলো সে, ব্যাপারটাকে চুরি বললে পেশাদার চোরেরা ভাবতে পারে তাদেরকে অসম্মান করা হয়েছে। সবার সামনে গাড়িটায় চড়ল সে। ইগনিশনে চাবি ছিল, স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। গোটা গ্যারেজে কিভাবে আগুন লাগল, কয়েকশো দামী গাড়ি কিভাবে পুড়ে ধাতব আবর্জনায় পরিণত হলো, এ-সব গিল্টি মিয়া দেখেনি। প্রশ্ন করা হলে রানার কাছে শুধু এইটুকু স্বীকার করবে সে: ফেরার আগে দেশলাইয়ের গোটা কতক জ্বলন্ত কাঠি ড্রামগুলোর মাঝখানে ফেলে দিয়েছে, কিন্তু তারপর কি ঘটেছে না ঘটেছে তা সে দেখতে গেছে নাকি?

যাই হোক, নির্দিষ্ট সময়ে লবডং নাইটলাইফ-এর সামনে ঠিকই হাজির হলো গিল্টি মিয়া। কিন্তু পৌঁছে দেখে ওস্তাদোঁকা ওস্তাদ, তার স্যারের দেখা

নেই। গেটের দারোয়ান চেষ্টা করল মার্সিডিজটা যাতে খানিক সরিয়ে রাখা হয়। কিন্তু তাকে রাজি করানো গেল না। গিল্টি মিয়া মার্সিডিজের ব্যাকসীটে পাওয়া একটা টেবিল-ক্লক প্রেজেন্ট করল দারোয়ানকে। কৃতজ্ঞ লোকটা বলল, 'ঠিক আছে, কিছুক্ষণ এখানে থাকতে পারো তুমি।'

এর একটু পরই আকাশ থেকে জড়াজড়ি করে মার্সিডিজের ব্যাক সীটে পড়ল তার সার আর এক ডানাকাটা পরী।

'এ যে দেকচি রাজকন্যে গো!' উৎফুল্ল গিল্টি মিয়া বলে উঠল। 'তা সিসটার-ইন-ল, মনে হচ্চে আকাশ থেকে পড়লেন?'

বাঁক ঘোরার সময় পিচ ঢালা রাস্তার সঙ্গে চাকার ঘর্ষণে কর্কশ শব্দ উঠল, আঁতকে উঠে শমি বলল, 'এ লোক তো দেখছি খুন করে ফেলবে!' রানার গায়ে ঢলে পড়ল সে। প্রথম সুযোগেই তার ড্রেসের সামনের অংশে বিনা দ্বিধায় হাত ঢুকিয়ে দিল রানা।

হঠাৎ রানার এই কাণ্ড খেপিয়ে তুলল শমিকে। 'তুমি তো দেখছি আচ্ছা ছোটলোক! এই মাত্র পরিচয় হয়েছে কি হয়নি, অথচ...'

'নিজেকে অতটা বড় করে দেখো না। প্রতিষেধকের শিশিটা কোথায়?' ড্রেসের ভেতর শক্ত কিছু একটার অস্তিত্ব টের পাচ্ছে রানা। তবে বিষক্রিয়ার ফলে ওর আঙুলে কোন সাড় নেই।

হাতের তালু দিয়ে শিশিটা ঘষল ও, গড়িয়ে আঙুলের ডগার কাছে নিয়ে এলো, শমির ব্রা থেকে বের করে প্যাঁচ ঘুরিয়ে ছিপি খুলল, তারপর উপুড় করে ধরল হাঁ করা মুখে। ঢোক গিলে বিকৃত করল মুখটা। 'ও-য়্যা-য়্যা-ক!' বমিটা কোন রকমে ঠেকিয়ে রাখল। জিনিসটা বেজায় তেতো।

'তোমার অবস্থা বিশেষ ভাল মনে হচ্ছে না।'

'মারাত্মক বিষের সঙ্গে আমার ঠিক বনিবনা হয় না।' শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছল রানা, তারপর পিছনের কাঁচ দিয়ে ফেলে আসা রাস্তার দিকে তাকাল। 'গিল্টি মিয়া, স্পীড বাড়াও! কালো একটা ক্যাডিলাক পিছু নিয়েছে।'

সাইড উইন্ডোর কাঁচে নিজের ছবি দেখে কান্না পেল শমির। 'দেখো তুমি আমার কি বেহাল অবস্থা করেছ! দুটো নখ ভেঙে গেছে। সারা মুখে লিপস্টিক মাখামাখি। হীরে মনে করে বরফের টুকরো তোলায় হাতব্যাগের ভেতর সব ভিজে গেছে-,' সে ভাবছে, এখন যদি সিরিকিত লবডং তাকে ধরতে পারে, স্রেফ জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

গুলির শব্দ হলো। মার্সিডিজের ছাদ আগেই জায়গা মত তুলে দিয়েছে গিল্টি মিয়া, পিছনের জানালার কাঁচ তো চুরমার হলোই, ক্যানভাসের টপও ফুটো হলো। সীটের কোণ থেকে লেদার ব্যাগটা টেনে নিয়ে ভেতর থেকে প্রিয় অস্ত্রটা বের করল রানা- ওয়ালথার। 'তোমার নখ আবার গজাবে,' শমিকে বলল ও। 'মুখ ধুয়ে লিপস্টিকও নতুন করে লাগানো যাবে। কিন্তু একটা বুলেটকে তুমি বাধা দিতে পারবে না।' অকস্মাৎ যেন গর্জে উঠল রানা। 'গিল্টি মিয়া, ডানে! ডানে ঘুরে টানেলে ঢোকো!' তারপর সীটের ওপর ঘুরে বসে কালো

ক্যাডিলাককে লক্ষ্য করে দুটো গুলি করল।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' শমি আতঙ্কিত।

টানেলের ভেতরও পিছু লেগে থাকল ক্যাডিলাক, কিন্তু বেশ দূরে, পিস্তল রেঞ্জের বাইরে। হেডলাইট দুটো ভুতুড়ে লাগছে।

'এয়ারপোর্ট!' বলল রানা। 'না! গিল্টি মিয়া, বাঁ দিকে!' সামনের সীটের ওপর ঝুঁকল ও, একটা হাত রাখল হুইলে, বাঁক নিতে সাহায্য করছে গিল্টি মিয়াকে।

হাইওয়েতে উঠে আসার পর ক্যাডিলাক পিছিয়ে পড়ল। গিল্টি মিয়া মার্সিডিজের স্পীড নব্বুইয়ের ঘরে তুলে ফেলেছে। ঘাড় ফিরিয়ে শমির দিকে তাকাল সে। 'উড়তে কেমন লাগচে, সিসটার-ইন-ল?'

এত বিপদের মধ্যেও নিজের সম্মান ও মর্যাদার কথা ভেবে রীতিমত বিদ্রোহ করল শমি। 'সিসটার-ইন-ল? রানা, তোমার কাছে আমি এর ব্যাখ্যা চাই! এক ব্যাটা উজবুক আমাকে...'

'তুমি ভারতীয়, এটা তো পরিষ্কার,' বলল রানা। 'ব্যাখ্যা দেয়াটা সহজ হবে যদি জানতে পারতাম কোন রাজ্যের মেয়ে তুমি।'

'আমি তোমাদের বাংলা কথা বুঝতে পারছি, তারপরও বলে দিতে হবে?' শমি অসহিষ্ণু ও বিরক্ত বোধ করছে। হাতব্যাগটা খুলে উপুড় করল সে। পায়ের কাছে ঝর ঝর করে খানিকটা পানি পড়ল, কিন্তু সে দিকে তার খেয়াল নেই—পানির সঙ্গে ঠক করে হীরেটাও পড়ল।

আলগোছে সেটা তুলে নিয়ে জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে রেখে দিল রানা। 'তুমি সত্যি বাঙালী?' রানার আকস্মিক আবেগ ও উল্লাস নির্ভেজাল। 'গিল্টি মিয়া তোমাকে বোধহয় ভাইয়ের বউ বা বৌদি বলে ধরে নিয়েছে। না-না, এর মধ্যে আমাকে জড়ানো ঠিক হবে না, বলতে পারো আমি হয়তো এর মধ্যে নেই-ই—ওর আসলে অনেকদিন থেকেই ঠিক তোমার মত একটা মেয়ের ভাসুর হবার খুব শখ আর কি।'

'এ-ব্যাপারে ওর সঙ্গে পরে আমার বোঝাপড়া হবে,' ঠোঁট বাঁকা করে বলল শমি।

'গিল্টি মিয়া, প্লেনের টিকিট কেটেছ?' জানতে চাইল রানা।

'বেবস্থাটা আসলে মৌকিক হয়েচে, সার। তবে কুনো সমস্যা হবে না।'

'কিন্তু আমার কি হবে? তোমরা কি আমাকে কাঞ্চনবারিতে ফেলে রেখে পালাবার কথা ভাবছ?' শমিকে হঠাৎ অসহায় দেখাল।

'সিসটার-ইন-ল বললে আমি কি হই? ব্যাটা উজবুক।' গিল্টি মিয়াকে ম্লান ও বিষণ্ন দেখাল। 'আপনারাই বলুন, একটা উজবুকের কতটুকুই আর ক্ষেমতা! পিচনে খুনী লিয়ে টারমাকে পৌচাব।' মাথা নাড়ল সে। 'ওকানে কেউ আমাদের জন্যে অতিরিক্ত টিকিট লিয়ে বসে নেই।'

'রানা, বিশ্বাস করো, হীরেটা থাকলে তোমাকে আমি দিয়ে দিতাম!' শমির প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। 'কিন্তু আমার কাছে টাকা-পয়সা কিচ্ছু নেই। যেমন করে হোক তোমরা আমাকে বাঁচাও!'

'হীরেটা পেলে সত্যি দিয়ে দিতে? জানতে চাইল রানা। 'ভাল করে ভেবেচিন্তে জবাব দাও, শমি। এমন কিছু বোলো না পরে যাতে পস্তাতে হয়।'

অকস্মাৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠল শমি, চোখে তীব্র সন্দেহ নিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'হীরেটা কি তোমার কাছে?' প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইল সে।

মাথা নাড়ল রানা। 'তোমার কাছে।'

'হোয়াট!'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি লেগে রয়েছে। 'আমি তোমার জবাব শোনার অপেক্ষায় রয়েছি।'

অতি ব্যস্ততার সঙ্গে হাতব্যাগে হাত ভরে হাতড়াচ্ছে শমি। তারপর মনে পড়ল বরফ গলা পানি ফেলবার জন্যে ব্যাগটা উপুড় করেছিল সে। ঝুঁকে পায়ের চারদিকে তাকাল। কোথাও কিছু নেই। 'তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ!' রেগে গেল সে।

'ঠাট্টা করি বা না করি, সেটা বিষয় নয়–তোমার কাছে থাকলে হীরেটা আমাকে দেবে কিনা তাই বলো। ওটা তো দেবেই, আর গিল্টি মিয়ার মনে যে ক্ষতটা তৈরি হয়েছে সেটাও সারিয়ে দিতে হবে। বিনিময়ে যেভাবে হোক প্লেনে তোমাকে আমরা তুলে নেব। এবং এ-ও বিশ্বাস করতে বলি যে হীরেটা সত্যি এখানে আছে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল শমি। 'ঠিক আছে, আধাআধি বখরা।'

'মানে?'

'হীরেটা কয়েক কোটি টাকায় বিক্রি হবে,' ঘন ঘন ঢোক গিলে বলল শমি। 'ওটা তোমার একা হজম করতে চাওয়া কি ঠিক?'

হেসে উঠল রানা। 'দূর বোকা! চক্রি রাজবংশের প্রথম রাজা রামা এক-এর দেহভস্ম যেমন বর্তমান রাজা ভূমিবলের হাতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে, এই হীরেটাও কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে তাঁর কাছে চলে যাবে। এ-সব আমাদের কিচ্ছু না, থাই জাতির ঐতিহ্য, তাই না?'

'তাহলে যে ছাইটুকু এত ঘটা করে সিরিকিত লবডংকে দিলে, সেটা কার?'

'ওই ছাই সংগ্রহ করা হয়েছে একটা ক্রেমাটরিয়াম থেকে,' বলল রানা। 'তবে বাক্সটা পুরানো, ওই যুগেরই।'

'তারমানে যে জিনিস কোনদিনই আমাদের কারও হবে না, সেটার জন্যে জান বাজি রেখে লবডংদের সঙ্গে লড়ছিলাম?'

ফাঁকা হাইওয়েতে মার্সিডিজের স্পীড আরও বাড়াচ্ছে গিল্টি মিয়া। এঞ্জিনের গর্জনকে ছাড়িয়ে উঠল তার চিৎকার। 'আরে, আমিও তো লবডংদের সঙ্গে লড়েচি!'

'সে কি! কোথায়?' রানা বিস্মিত।

ক্যাডিলাকের বদলে মার্সিডিজ কোত্থেকে এলো, দ্রুত ব্যাখ্যা করল গিল্টি মিয়া। লবডংদের গ্যারেজের ক্ষতির মাত্রা আন্দাজ করতে পেরে তৃপ্তিবোধ করল রানা। হীরেটা বের করে শমির দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। 'এটা তোমার হাতব্যাগ থেকেই একটু আগে পড়েছিল, তুলে পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। নেড়েচেড়ে

দেখে ফেরত দাও। এটা সত্যি আমাদের জিনিস নয়।'

হীরেটা শমি ছুঁলোই না। 'যত দেখব ততই লোভ জাগবে, তারচেয়ে তোমার কাছেই থাক, সুযোগ মত ফিরিয়ে দিয়ো। তবে যাই করো, আমাকে না দেখিয়ে নয়।' হাত লম্বা করে গিল্টি মিয়ার উল্টো করা ক্যাপটা একবার ছুঁলো সে। 'আমার ধারণা, গিল্টি কারও নাম হওয়া উচিত নয়। আমি যদি তোমাকে বড়ভাই বলে ডাকি, তাতে তোমার কোন আপত্তি আছে?'

'নাহ্! আমার আবার কিসের আপিত্তি!' কি এক কুণ্ঠায় বা আবেগে ছোট্ট মানুষটা ড্রাইভিং সীটে কুঁকড়ে আরও যেন ক্ষুদ্র হয়ে উঠল। 'তবে আমিও সিসটার-ইন-ল না বলে সিসটার বলে ডাকব, আপনিও কোনও আপিত্তি করতে পারবেন না, এই বলে দিলুম!'

'তোমাকে উজবুক বলে সত্যি আমি ভারী অন্যায় করেছি, বড়ভাই!' গলার সুরই প্রমাণ যে শমি আন্তরিক।

শমির বড়ভাই ডাকটা গিল্টি মিয়ার কানে যেন মধুবর্ষণ করল। গাল-ফাড়া হাসি ফুটল ওর মুখে।

'তো রানা, প্লেনে করে আমরা যাচ্ছি কোথায় সেটাই তো জানা হলো না।'

'আমি বলচি।' বাঁক ঘোরার আগে স্পীড কমাল গিল্টি মিয়া, কাঁকর ছড়ানো ফাঁকা একটা জায়গা পেরিয়ে খোলা গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল এয়ারপোর্টে–গেটের মাথায় লেখা রয়েছে–লবডং এয়ারপোর্ট। পিছনের ক্যাডিলাক আবার কাছে চলে আসছে। 'পেলেনটা দিল্লি যাচ্চে।'

'দিল্লি!' আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল শমি।

ওয়ালথার আবার বের করেছে রানা। 'কেন, দিল্লিতে কে আছে তোমার?'

'বোর্ডিং স্কুলে ছোট ভাই,' বলল শমি। 'তারচেয়ে বড় কথা, দিল্লিতে ভাল কোন নাইটক্লাবে আমার চাকরি পাওয়ার বিরাট সম্ভাবনা আছে। মুম্বাই হলে সবচেয়ে ভাল হত, একবার চেষ্টা করে দেখতে পারতাম নায়িকা হওয়া যায় কিনা...'

ছোট একটা কার্গো এরিয়াকে পাশ কাটাল গিল্টি মিয়া। একটু দূরে, রানওয়েতে, স্টার্ট দেয়া একটা পেটমোটা ট্রাইমোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কর্কশ আওয়াজ তুলে অ্যাপ্রন-এ থামল মার্সিডিজ। লাফ দিয়ে নিচে নামল ওরা। রানার লেদার ব্যাগটা গিল্টি মিয়া বহন করছে।

ওরা বোর্ডিং গেটে পৌঁছেছে, লবডং ট্র্যাভেল এজেন্সির ম্যানেজার ছুটে এলো। 'আমি ডঙ থঙ, লবডং ট্র্যাভেল এজেন্সি ও লবডং এয়ারলাইন্সের ম্যানেজার। ভেতরে জায়গা হয়তো তিনজনেরই হবে, কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো ওটা কার্গো প্লেন–পোলট্রি নিয়ে যাচ্ছে।'

'এই লোক কি পাগল, না ঠাট্টা করছে?' প্রতিবাদ করল শমি।

'ম্যাডাম–,' শুরু করে থেমে গেল ম্যানেজার। তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'ম্যাডাম! আপনি বিখ্যাত গায়িকা শমিতা বেনেগাল না? ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল ডান্স করেন আমাদের লবডং নাইটলাইফে?'

বিস্ময় ও আনন্দের ধাক্কায় মুহূর্তের জন্যে শমি পাথর হয়ে গেল। এই বাজ

পড়া জায়গাতেও তার ফ্যান আছে! 'ইয়ে, হ্যাঁ, আমিই শমিতা...'

'আমি আপনার গানও শুনেছি, নাচও দেখেছি। আমি আপনার সাংঘাতিক একজন ভক্ত...'

শমি যখন ভাবছে দিনটাকে আজ তত খারাপ বলা চলে না, ঠিক এই সময় রানার মুখ থেকে যেন বুলেট ছুটল। 'তুমি অটোগ্রাফ দাও, সুন্দরী। আমাদেরকে যেতে হচ্ছে।'

গিল্টি মিয়াকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল রানা। এক মুহূর্ত পর কালো ক্যাডিলাকটাকে এয়ারপোর্টে ঢুকতে দেখে শমিরও ঘোর কাটল। 'মিস্টার ডঙ থঙ, শুনে খুব খুশি হলাম যে আপনি আমার ফ্যান, কিন্তু এখন আমাকে যেতে হচ্ছে।' তারপর, কর্কশ সুরে, রানার উদ্দেশে, 'কী আশ্চর্য! আমার জন্যে অপেক্ষা করছ না!' ছুটছে বলা ঠিক নয়, প্লেনটাকে লক্ষ্য করে উড়ে যাচ্ছে সে ম্যানেজার হাত নাড়ল। শমি লাফ দিয়ে সিঁড়ি টপকে উঠে পড়ল প্লেনে।

লোডিং এরিয়ার কাছে থামল কালো ক্যাডিলাক। সিরিকিত লবডং নামল, পিছু নিয়ে কয়েকজন পিস্তলধারী গুণ্ডা। টারমাকে তাকাতে কার্গো প্লেনটাকে রওনা হবার প্রস্তুতি নিতে দেখল সিরিকিত, দেখল সচল হয়ে ওঠা প্লেন থেকে তার উদ্দেশে হাত নেড়ে কার্গো বে বন্ধ করে দিল রানা।

সিরিকিতের লোকজন নির্দেশের অপেক্ষায় ব্যগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিন্তু উত্তরে সিরিকিত ক্রূর হাসি হাসল। বাঁক নেয়া শেষ করে প্লেনটা যখন ছুটল, গায়ের লেখাটা পরিষ্কার পড়া গেল—লবডং এয়ার ফ্রেইট। পাইলট তাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে সালাম করল। জবাবে সিরিকিতও একটা হাত উঁচু করল। প্লেনটাকে থামাবার কোনও রকম চেষ্টা করল না।

ভোরের প্রথম কমলা আলোয় আকাশে ডানা মেলল রূপালি প্লেন।

চার

উত্তর ঘেঁষা পশ্চিম দিকে রওনা হলো ওরা। কোঁচকানো ও ভেজা ড্রেস পরা শমি একটু উষ্ণতা খুঁজছে, পরিবর্তে ডজনখানেক কাঠের বাক্স আর এক ঝাঁক নার্ভাস মুরগীর হামলার শিকার হতে হলো বেচারিকে। 'ঠোকর মারা বন্ধ করো, তা না হলে চিকেনবার্গার বানিয়ে খেয়ে ফেলব!' শমির জন্যে এ পরিবেশ সত্যি সহ্য করার মত নয়।

প্লেনের পিছন দিকের দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে আসছে মাসুদ রানা। এ তো একটা সমস্যাই, তাকালে চোখ ফেরানো যায় না! রানা ভোল পাল্টেছে। রঙ ওঠা লেদার জ্যাকেট পরেছে ও, শার্টটা খাকি, কোমরে জিনস, পায়ে কেডস্। কারনিস সহ মাথায় একটা হ্যাটও দেখা যাচ্ছে। লেদার ব্যাগটা বাম কাঁধে, ডান কোমরে বহুল ব্যবহৃত একটা দামী হোলস্টারে রয়েছে ওর প্রিয় ওয়ালথার পিপিকে। বাম বাহুতে ভাঁজ করা সুট নিয়ে হেঁটে এলো ও, দুজনের ঠিক

মাঝখানে বসল, পরিত্যক্ত কাপড়চোপড় মেঝেতে ফেলে দিগ্বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসল একবার গিল্টি মিয়া আরেকবার শমির দিকে চেয়ে।

'এখন হাতে একটা চাবুক থাকলে দারুণ মানাত,' বলল শমি। 'ঠিক মনে হতো, বাঘ-ভালুক পোষ মানাবার চাকরিতে ইন্টারভিউ দিতে চলেছ বুঝি!' কৌতুক বোধ করছে সে। পুরুষরা আসলে চিরকালই বালক থেকে যায়।

'দেখো, সঙ্গে ঝুলে থাকার অনুমতি দিয়ে আমি বিরাট মহত্ত্ব দেখিয়েছি, খুশি হব মুখটা বন্ধ রেখে তার প্রতিদান দিলে। ঠিক আছে?' সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে তার পায়ে মৃদু চাপড় দিল। কোন সন্দেহ নেই, মেয়েটা ওর স্নায়ুতে চেপে বসতে চাইছে।

উরু থেকে রানার হাতটা সরিয়ে দিল শমি। ঝুঁকে মেঝে থেকে রানার ডিনার জ্যাকেটটা তুলল। 'ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি। কি বললে, সঙ্গে ঝুলে আছি? কিন্তু নাইটক্লাবে ঢোকার পর থেকে তুমি তো আমার ওপর থেকে চোখই সরাতে পারছ না!' প্লেনের পিছন দিকে রওনা হলো সে, কোটটা কাঁধে জড়াচ্ছে।

'আচ্ছা, তোমার বুঝি তাই ধারণা?' হাসল রানা, মুরগী ভর্তি কাঠের বাক্সের দেয়াল ঘেঁষে শুলো, হ্যাট দিয়ে মুখ ঢেকে চেষ্টা করল ঘুমাতে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ল।

ককপিটের দরজা সামান্য একটু ফাঁক হলো। সেই ফাঁকে একটা চোখ রেখে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কার্গো হোল্ডের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে কো-পাইলট। দেখল প্লেনের পিছন দিকে একটা পাটের বস্তাকে ভাঁজ করে বালিশ বানিয়ে ঘুমাচ্ছে শমি—পরনে রানার ট্রাউজার, সাদা শার্ট আর জ্যাকেট। রানা শুয়েছে পোর্টসাইডে, মুখটা হ্যাট দিয়ে ঢাকা। হাড্ডিসার গিল্টি মিয়া ওর কাছাকাছি শুয়ে নাক ডাকছে, ভাঁজ করা হাঁটু প্রায় বুকের কাছে তোলা।

ঘাড় ফিরিয়ে পাইলটের দিকে তাকাল কো-পাইলট। সিরিকিত লবডং, ওদের বস্, রেডিওতে জরুরী নির্দেশ পাঠাচ্ছে। চোখাচোখি হতে পাইলট মাথা ঝাঁকাল।

বড় একটা রেঞ্চ তুলে নিয়ে রানাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে কো-পাইলট। এক মুহূর্ত পর সে তার সিদ্ধান্ত বদলাল। রেঞ্চটা রেখে দিল সে, বেল্ট থেকে বের করল ছুরিটা।

কো-পাইলট বাগিয়ে ধরা ছুরি নিয়ে দরজার চৌকাঠ পেরোচ্ছে, এমনি সময়ে রানা পাশ ফিরে শুলো। দ্রুত পিছু হটে ঢুকে পড়ল ককপিটে লোকটা।

পাঁই ভাষায় অশ্রাব্য একটা খিস্তি করে কো-পাইলটের হাতে একটা পিস্তল ধরিয়ে দিল পাইলট। অস্ত্রটা পরীক্ষা করার সময় কো-পাইলট জানতে চাইল, ছোট্ট খোকার মত বয়স্ক লোক আর পরীর মত সুন্দরী মেয়েটাকেও মারতে হবে কিনা। পাইলট মাথা ঝাঁকাল। কো-পাইলট ছোট্ট এক লাইনের ভূমিকায় বলল—অহিংসা পরমো ধর্ম। তারপর বলল, এই কাজ করলে তার মহাপাপ হবে। পাইলট প্রবলবেগে মাথা নেড়ে তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করল। তর্ক-বিতর্ক একবার শুরু হলে কার সাধ্য থামায়। তারা যে-যার পূর্বপুরুষদের প্রসঙ্গ

ও উদাহরণ টেনে নিজের নিজের অবস্থানে অটল থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

অবশেষে পিস্তলটা ফেরত নিল পাইলট, কো-পাইলটকে কন্ট্রোল-এর দায়িত্ব নেয়ার নির্দেশ দিল, তারপর কাজটা সমাধা করার জন্যে নিজেই রওনা হলো।

রানা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। পাইলট ওর দিকে এক পা এগিয়েছে, এই সময় মাথার ওপর কাঠের বাক্স থেকে একটা ডিম পড়ল–পড়ল দু'ইঞ্চি পুরু একটা ন্যাকড়ার ওপর, তারপর একটা সরু ও লম্বা তক্তার কিনারা ঘেঁষে গড়াতে শুরু করল, তক্তাটার শেষ মাথা থেকে খসল, এবার নামল একটা মুরগীর পিঠে, সেখানে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে আবার খসল, এবার খাঁচার ফাঁক গলে নেমে আসছে শক্ত মেঝেতে। ঠিক এই সময় রানার একটা হাত লম্বা হয়ে গেল, আঙুলগুলো একটু বাঁকা হয়ে আছে। ডিমটা পড়বি তো পড় ওই হাতের ঠিক মাঝখানে।

এটা স্রেফ একটা কাকতালীয় ঘটনা, কিন্তু পাইলট থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কারণ ছোট্ট এই ঘটনার মধ্যে বিরাট অলৌকিক তাৎপর্য দেখতে পেয়েছে সে। প্রতিপক্ষ বিপজ্জনক, ঈশ্বর বা শয়তান তাকে সাহায্য করছে, এই উপলব্ধি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল তারা। সিরিকিত লবডং নির্দেশ দিলে সেটা পালন করতে হয়, তা নইলে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে ডেকে আনা হবে। সিদ্ধান্ত নিল, গোটা ব্যাপারটা তারা নিয়তির ওপর ছেড়ে দেবে।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের একটা লিভার টেনে ফুয়েল ট্যাংক খালি করে ফেলল পাইলট। কো-পাইলট নিজেদের জন্যে বের করল দুটো প্যারাসুট। তারপর, নিঃশব্দ পায়ে, প্লেনের পিছন দিকে রওনা হলো।

শমির ঘুম ভাঙতে সে শুধু অস্পষ্টভাবে কো-পাইলটকে আফটার বে-তে দেখতে পেল, নিজের পিছনে পর্দাটা টেনে দিচ্ছে। পাশ ফিরে আবার চোখ বুজতে যাবে, এই সময় দেখল ককপিট থেকে বেরিয়ে প্লেনের পিছন দিকে হেঁটে এসে একই পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল পাইলটও।

ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল শমির। এটা বিরাট বড় কোন প্লেন নয় যে দু'জনের বেশি ক্রু লাগবে। প্লেনটা তাহলে চালাচ্ছে কে?

উঠে পড়ল শমি। এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল ককপিটে। প্লেনটা কেউ চালাচ্ছে না। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ছাড়ল, তারপর বলল, 'প্লেনটা কেউ চালাচ্ছে না!'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল গিল্টি মিয়ার। বিষের প্রভাবে ক্লান্ত রানা একচুল নড়ল না। ছুটে প্লেনের পিছন দিকে চলে এলো গিল্টি মিয়া। পর্দা ফাঁক করতেই দেখতে পেল খোলা কার্গো ডেকের কিনারায় পাইলট তার কো-পাইলটকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দু'জনের পিঠেই প্যারাসুট বাঁধা।

'খেয়েচে গো! মেরেচে! সার, হেলপ্! পাইলটগুনো পেলেন ছেড়ে পালাচ্ছে!'

ছুটে এসে রানার গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল শমি। 'রানা, বাঁচাও!'

অনেক কষ্টে চোখ মেলল রানা। 'এরই মধ্যে পৌঁছে গেলাম? না, তা কি

করে হয়। নিশ্চয়ই ফুয়েল নেয়ার জন্যে নেমেছে।'

ওকে ধরে অনবরত ঝাঁকাচ্ছে শমি। 'প্লেন নামেনি, বোকা! চলতি প্লেন থেকে পাইলট আর কো-পাইলট নেমে যাচ্ছে! ওঠো! কিছু একটা করো!' যাকে দেখে মনে হয় এরকম পৌরুষ খুব কম মানুষের মধ্যেই থাকে, সে হয়তো প্লেন চালাতেও জানে।

সিধে হয়ে ছুটল রানা। পর্দা সরিয়ে দেখে কেউ নেই। খোলা দরজার বাইরে খালি আকাশে প্যারাসুট দুটো ওর চোখের সামনে ফুলে উঠল। আবার এক ছুটে ককপিটে ঢুকল ও, পিছু নিয়ে শমিও। দু'সেকেন্ডের মধ্যে পাইলটের সীটে বসে নিজের হাতে কন্ট্রোল তুলে নিল রানা। ওর আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার পরিচয় পেয়ে শমি তো মুগ্ধ। কৃতজ্ঞতায় তার চোখে জল চলে আসছে। হাসছে সে। মাথা দোলাচ্ছে। ইচ্ছে করছে এক পাক নেচে নেয়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভাবছে যত যা-ই ঘটুক—পৃথিবীতে এই পুরুষটির অস্তিত্ব থাকায় সে অবশ্যই লাভবান। পরম স্বস্তির সঙ্গে জানতে চাইল, 'তুমি তাহলে প্লেন চালাতেও জানো!'

কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর চোখ বুলাল রানা, দুটো নব ঘোরাল, একটা সুইচ অন করল, অবশেষে হুইল ধরে বলল, 'না।' তারপর, চ্যালেঞ্জের সুরে, 'তুমি?'

শমির মুখ সাদা হয়ে গেল, অনুভব করল পেটের সব কিছু ওপরে উঠছে।

হঠাৎ দুষ্ট হাসি হেসে রানা বলল, 'এমনি ঠাট্টা করলাম। চিন্তা কোরো না, সব সামলে নিচ্ছি। প্রথমে অলটিমিটার: চেক। স্টাবিলাইজার: ঠিক হ্যায়। এয়ার স্পীড: ওকে। ফুয়েল—'

এরপর দীর্ঘ বিরতি। শমির কাছে রানার এই মৌনতা শান্তি বা সুধাময় বলে মনে হলো না। 'ফুয়েল?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ফুয়েল? ফুয়েলের কি অবস্থা?'

ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা সীট ছেড়ে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল শমি। এক-এক করে এঞ্জিনদুটো বার কয়েক খক-খক কেশে বন্ধ হয়ে গেল। সবগুলো প্রপস নিশ্চল হয়ে পড়েছে। নাক নিচের দিকে তাক করে প্লেনের পতন শুরু হলো।

'আমরা একটা সমস্যায় পড়েছি,' বলল রানা। শমিকে পাশ কাটিয়ে হোল্ডে ঢুকল। 'গিল্টি মিয়া!'

রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এলো গিল্টি মিয়া। 'আমি সার আগেই সব ঘেঁটে দেকেচি। শালারা কোন প্যারাসুট রেকে যায়নি।' শমিকে দেখে দাঁত দিয়ে জিভ কেটে নিজের দু'গালে চড় মারার ভঙ্গি করল। 'গাল দিয়ে ফেললুম, কিচু মনে করবেন না।'

স্টোরেজ লকার চেক করে কিছু পেল না রানা।

কি মনে করে ছুটে ককপিটে ফিরে এলো শমি। কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে, 'মা দুর্গা! দুর্গতিনাশিনী মা!...' হঠাৎ জানালার বাইরে চোখ পড়তে একটা পাহাড় চূড়াকে ছুটে আসতে দেখল সে। 'রা-আ-আ-না-আ-আ!' আর্তনাদ বেরিয়ে এলো গলা চিরে। তবে সৃষ্টিকর্তা উদারতা দেখাতে কার্পণ্য করলেন না, অন্তত এ যাত্রা। পাথুরে চূড়ার সঙ্গে

প্লেনটা কয়েক ইঞ্চির জন্যে ঘষা খেলো না।

হৃৎপিণ্ড প্রায় থেমে যাবার অবস্থা, ককপিট থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে শমি দেখল স্টোরেজ বিন থেকে বিরাট একটা হলুদ ক্যানভাস টেনে বের করছে রানা। ক্যানভাসটা ভাঁজ করা, একপাশে লেখা রয়েছে—ইমার্জেন্সী লাইফ রাফট্। 'তুমি পাগল নাকি?' রাগে-দুঃখে চেঁচিয়ে উঠল সে। তার কান্না পাচ্ছে।

শমিকে গ্রাহ্যই করল না রানা। 'গিল্টি মিয়া, আমাকে একটু সাহায্য করো।'

দু'জন টেনে-হিঁচড়ে খোলা কার্গো ডোর-এর সামনে নিয়ে এলো ভাঁজ করা ক্যানভাসটাকে। শমি এখনও চেঁচাচ্ছে। 'উন্মাদ! বদ্ধ উন্মাদ! লাইফ রাফট্? ভেলা? এ তো পানিতে ভাসে! আমরা ডুবছি না, বোকা কোথাকার! আমরা খেঁতলে যাচ্ছি! গুঁড়ো গুঁড়ো হতে চলেছি!'

'আরে, ধ্যাৎ, চিৎকার থামিয়ে এদিকে এসো দেখি!' নির্দেশ দিল রানা। 'গিল্টি মিয়া, সরে এসো, শক্ত করে জড়িয়ে ধরো আমাকে।'

পিছন থেকে রানার কোমর পেঁচিয়ে ধরল গিল্টি মিয়া। ভয়ে ঘাম ছুটছে সারা শরীর থেকে, বলল, 'আমি সার চোক বুঁজে থাকব। যদি মরি, আর লাশটা যদি খুঁজে পান, কবরটা ঢাকার আজিমপুরে হলেই ভাল হয়।'

শমি সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করছে। ওদের সঙ্গে শূন্যে লাফ দেয়া ভাল, না প্লেনে থাকা ভাল? একা মরতে ভয় লাগবে, উপলব্ধি করল সে। 'এই! এই! আমার জন্যে অপেক্ষা করো!' সোনালি ড্রেসটা ছোঁ দিয়ে তুলল সে—কোথায় গিয়ে পড়বে কে জানে, নিজের অন্তত এক সেট কাপড় সঙ্গে থাকা দরকার। ছুটে এসে রানার গলা জড়িয়ে ধরল। জড়িয়ে ধরল মানে প্রায় ঝুলেই পড়ল। তবে দু'জনেই তারা রানার পিছনে।

লাইফ রাফট্ সামনে ধরে বিসমিল্লাহ বলে লাফ দিল রানা, ইনফ্লেইশন কর্ড ধরে টানও দিল সঙ্গে সঙ্গে।

ওড়ার জন্যে তৈরি, গিল্টি মিয়া চোখ বুজল।

পাঁচ

ওদের মাথার ওপর পুরো আকৃতি নিয়ে বাতাসে ফুলে উঠল লাইফ রাফট্, বিরাট একটা ঘুড়ির মত দেখাচ্ছে, তীব্র বাতাসে গা ভাসিয়ে উড়ে চলেছে শাঁই-শাঁই করে, নিচে ঝুলে আছে আতংকে প্রায় অসাড় তিনটি প্রাণী, যেন অনন্তকাল ধরে।

পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা, একশো গজ দূরে কার্গো প্লেনটা মাটিকে চুমো খেলো—বিস্ফোরিত হলো একই সঙ্গে পাথর, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, ঝলসানো মুরগী, ভাঙা ডিম ইত্যাদি। এক মুহূর্ত পর একটা পাহাড়ের চূড়া টপকে এসে ঢালের বরফে ঘষা খেলো ওদের লাইফ রাফট্, তারপর আর শূন্যে উঠতে পারল না। হড়কে বরফের ঢাল বেয়ে নিচে নামছে তীরবেগে। অনেক নিচে বাঁশ ঝাড়।

এক সেকেন্ডের জন্যে চোখ মেলে শমি সিদ্ধান্ত নিল—এই মৃত্যু সে দেখতে চায় না। বাঁশ ঝাড়ের ফাঁক গলে যদি বেরোতেও পারে, সামনে সারি সারি গাছ, সংঘর্ষ ঘটতে বাধ্য। কিন্তু প্রায় অলৌকিকভাবে গাছগুলোকে এড়িয়ে একটা পাহাড়ী ঝর্ণাকে পাশ কাটাল রাফট। বিশ সেকেন্ড পর ঝপাৎ করে পড়ল একটা পাহাড়ী নালাতে। ভেলাটা যেন তার পছন্দের গন্তব্যে পৌঁছাতে পেরে আহ্লাদে আটখানা, ওদেরকে নিয়ে নাচতে নাচতে স্রোতের সঙ্গে ছুটছে।

'রবিন হুডের ওস্তাদ!' রানার দিকে ইঙ্গিত করে শমিকে বলল গিল্টি মিয়া। 'সার, জীবনে আপনি অনেক পুণ্যি করেচেন, সঙ্গে থাকায় তার পুরস্কার আল্লাহ আমাদেরকেও একটু দিলেন।'

'আমাকেও রানাই সাহায্য করল, অস্বীকার করছি না, তবে ও হলো স্রেফ মাধ্যম,' বলল শমি, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। 'ভাল কাজের পুরস্কার আমি পেয়েছি মা দুর্গার কাছ থেকে।'

'সার!' আতংকে চেঁচিয়ে উঠল গিল্টি মিয়া। 'এবার নির্ঘাত মরেচি!'

সময় মত ঘাড় ফেরাতে রানা দেখল নালার দু'পাশের ঝোপ-ঝাড় হঠাৎ বাঁক নিয়েছে—ছুটছে ওরা সোজা আকাশ লক্ষ্য করে। পাহাড়ের মাথা থেকে আবার উড়াল দিল ওরা শূন্যে। ভয়ে কেউ নিচের দিকে তাকাচ্ছে না।

নালার পানি জলপ্রপাত হয়ে আরও চওড়া একটা নদীতে নামছে। ওদের পতনটা সহনীয়ই হলো—ভেলা ডুবল না, ওরাও রাফটের কিনারা ও পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে থাকল। লাইফ রাফট আবার ছুটছে, গতি আগের চেয়েও বেশি। বিপদ হলো, পানির ওপর অসংখ্য বিরাট আকারের বোল্ডার মাথা তুলে রেখেছে। এরকম বড় একটা বোল্ডারের সঙ্গে কোনাকুনি ভাবে ধাক্কা খেলো ভেলাটা, তাতে লাভ হলো এই যে দিক বদলে শান্ত একটা শাখা নদীতে ঢুকে পড়ল ওরা। তিনজনই নেতিয়ে পড়ল ভেলার মেঝেতে—ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, নিস্তেজ। প্রথমে গিল্টি মিয়া ইঞ্চি দুয়েক মাথা তুলল। 'সার?'

রানা একটু কাশল। 'ভাল, গিল্টি মিয়া। আমি ভাল আছি।'

শমি গোঙাচ্ছে। তার চুল ও কাপড়চোপড় ভিজে জবজব করছে। রানার প্রশ্নের জবাবে ঝাঁঝের সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করল সে, 'এরকম অবস্থায় একটা মেয়ে কিভাবে ভাল থাকতে পারে?' তবে জানতে চাওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। 'ভাল কথা, এ আমরা কোথায় এসে পড়লাম?'

অলস একটা ভঙ্গিতে তীরে থামল ভেলাটা—বলা উচিত, কুচকুচে কালো একজোড়া পায়ের ঠিক সামনে, নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পা জোড়া।

কে দাঁড়িয়ে আছে দেখবার জন্যে চোখ কুঁচকে সূর্যের দিকে মুখ তুলতে হলো রানাকে। 'ইন্ডিয়ায়।' ফিসফিস করল ও।

'জননী জন্মভূমি! পূর্ব-পুরুষদের পুণ্যই শুধু তোমার কোলে আমাকে ফিরিয়ে এনেছে, মা!' হঠাৎ থেমে শমি জানতে চাইল, 'কি করে বুঝলে?' তারপর রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে বুড়ো, লোলচর্মসর্বস্ব, হাড্ডিসার লোকটার দিকে তাকিয়ে দম বন্ধ করল সে। লোকটার পরনে ছেঁড়া কম্বল। গলায় রুদ্রাক্ষ আর পুঁতির তৈরি একগাদা মালা। গায়ের রঙ ঠিক যেন পোড়া কাঠকয়লা

দেখে মনে হলো একজন ওঝা, জাদুকর বা সন্ন্যাসী।

অকস্মাৎ অলৌকিক একটা দমকা বাতাস ওদেরকে ঘিরে হাহাকার ধ্বনি তুলল। লোকটার কালো মুখে উজ্জ্বল সাদা হাসি ফুটল। দুই হাত এক করে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল সে।

শমির প্রত্যুত্তরের দেখাদেখি রানা ও গিল্টি মিয়াও এক হাত তুলে লোকটার অভ্যর্থনার জবাব দিল।

ওরা হাঁটা ধরল। লোকটার সঙ্গে পাগড়ি ও কৌপীন পরা আরও চারজন গ্রাম্য লোক রয়েছে। ওদের পিছনে রানা–পিস্তলটা কখন হোলস্টার থেকে খসে পড়ে গেছে টের পায়নি বলে মন-খারাপ; তারপর গিল্টি মিয়া–এতোকিছুর পরও রানার লেদার ব্যাগটা ছাড়েনি, কাঁধে ঝুলছে এখন; আর সবশেষে শমি, হাতে সেই সোনালি ইভনিং গাউন আর হিল লাগানো জুতো। খানা-খন্দে ভর্তি পাথুরে পথ ধরে হাঁটছে ওরা। কোথাও প্রাণের কোনও সাড়া নেই। চারদিকে জঙ্গল আর ঢেউ খেলানো পাহাড়। জঙ্গল বলতে ঝোপই বেশি। গাছগুলো বেশিরভাগই অচেনা, একটাতেও খাবার যোগ্য কোন ফল নেই। বাতাসে ধুলোর গন্ধ।

খালি হোলস্টারটা কোমর থেকে খুলে ফেলে দিতে যাবে রানা, এমনি সময়ে কথা বলে উঠল গিল্টি মিয়া, 'খাপটা ফেলবেন না, সার। পড়ে যাচ্ছিল দেকে ভেতরের মালটা উটিয়ে লিয়ে এই ব্যাগে রেকে দিয়েছি।'

যার-পর-নাই খুশি হলো রানা। ওকে খুশি করতে পেরে হা-হা করে হেসে উঠতে যাচ্ছিল গিলটি মিয়া, রানাকে ভ্রূকুটি করতে দেখে দু-তিনটে হা-র পরেই থেমে গেল। বুঝল, আসলে হাসি মানাচ্ছে না এই পরিবেশে।

পথ চলতে চলতে সন্ন্যাসীর মত লোকটা রানার উদ্দেশে কথা বলছে। রানার মনে হলো, লোকটা কোন মন্দিরের পুরোহিত বা সেবায়েতও হতে পারে। ভাষা শুনে সন্দেহ হলো, লোকটা কি নাগা? আসামের পাহাড়-পর্বতে বাস করে উলঙ্গ কিছু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়, তাদেরকে নাগাই তো বলে। তবে এ লোকটার ভাষা অহমীয়া নয়। ভাষাটা আঞ্চলিক ও অপরিচিত হলেও, লোকটার আকার-ইঙ্গিত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করায় তার বক্তব্য বুঝতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না রানার। অসুবিধে হচ্ছে বক্তব্যের মর্ম হজম করতে।

'আমি মহাশয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম,' একই কথা বারবার বলে চলেছে লোকটা। 'যে-ঘটনাটা ঘটল, সেটা আমি অনেকদিন ধরে স্বপ্নে দেখে আসছি। হুবহু এক। আকাশ থেকে নদীর ধারে খসে পড়ল একটা উড়োজাহাজ। আপনারা নদী হয়ে তীরে পৌঁছালেন–ঠিক আমি যেখানে স্বপ্নে ও বাস্তবে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'শুধু রহস্য নয়,' বিড়বিড় করল শমি, 'আমি এর মধ্যে বিপদের গন্ধও পাচ্ছি।'

'ভাষাটা কোথাকার, কিছু বুঝতে পারছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দিল্লির ম্যাগাজিনে কিছু জংলী লোকের ফটো দেখেছি, এই লোকগুলোর সঙ্গে তাদের মিল আছে,' বলল শমি। 'এরা সম্ভবত অরুণাচল প্রদেশের লোক।'

'তুমি দিল্লিতে মানুষ হয়েছ?'

'বাঙালী মা জননী দিল্লিতে চাকরি করতে গিয়ে বেনিয়া বেনেগাল পরি বিয়ে করেন,' বলল শমি। 'কিন্তু বিয়েটা টেকেনি। ও-সব থাক। তোমার করছে না, লোকগুলো তোমার জন্যে নদীর ধারে অপেক্ষা করছিল শুনে?'

রানা কোন জবাব দিল না। তবে চিন্তিত।

'এই,' মেয়েলি কৌতূহল শমি দমন করতে পারল না, 'ওকে জিজ্ঞেস না, স্বপ্নটায় আমিও ছিলাম কিনা।'

হাসি চেপে চুপ করে থাকল রানা।

'স্বপ্নটায় শুধু আসাই আছে, যাওয়াটা কেমন হবে তা দেখায়নি?' থামছে না। 'খিদেতে আমি মরে যাচ্ছি, স্বপ্নে বলেনি কি খেতে পাব আমরা?'

পাথুরে জমিনের বদলে শুকনো কাদায় চলে এলো ওরা। একটু ধুলোর ঘূর্ণি দেখা গেল ওদের চারদিকে। তারপর, সারি সারি ঢেউ খেল পাহাড়ের গোড়ায়, গ্রামটাকে দেখতে পাওয়া গেল।

বৃদ্ধের কাছ থেকে জানা গেল, আসাম রাজ্যের সীমান্ত থেকে খুব বেশি নয় এই জায়গা। ওদিকে সোনাই রূপাই নামে একটা শহর আছে, সেখান থে ওদের এই গ্রাম দুশো কিলোমিটার উত্তর-পুবে, নাম স্বপ্নপুরী।

শুকনো খটখটে পথ ধরে গ্রামের ভেতর ঢুকল ওরা। চোখ বুলিয়ে বোঝা গে কি যেন এক বিপর্যয় ঘটে গেছে এখানে। করুণ, দীনহীন চেহারা নিয়ে গ্রামে লোকজন তিন অথবা চারজনের একেকটা দল বেঁধে পথের পাশে, ঘর-দুয়ারে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কারও চেহারায় এতটুকু খুশির চিহ্ন নেই। এ স্বপ্নপুরীর বাসিন্দা, অথচ কারও চোখে কোন স্বপ্ন নেই। মহিলারা শুকনো ক থেকে বালতি তুলছে, বালতিতে শুধু বালি। পাঁজরের হাড় বেরিয়ে পড়া ক জিভ বের করে ছায়ায় বসে হাঁপাচ্ছে। ছড়ানো-ছিটানো দু'একটা গাছের ড বসে রয়েছে ধৈর্যশীল শকুন। এ শুধুই খরা নয়। এ হলো বিলুপ্তির অপেক্ষা।

কারণটা বোঝা গেল না, কিছু রুগ্ন মহিলা ডুকরে কেঁদে উঠল, কিন্তু তা কারও চোখে জল নেই—এত মূল্যবান পানি শরীরই হয়তো হাতছাড়া ক রাজি নয়।

ব্যাপারটা হঠাৎ করেই উপলব্ধি করল রানা। স্বপ্নপুরী গ্রামে ছেলেমেয়ে নেই। একটাও না!

ওদেরকে একটা পাথুরে ঘরে নিয়ে আসা হলো। কোন জানালা না রোদ ঢুকতে পারছে না, ফলে ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। 'সঙ্গীদের নিয়ে মহাশয় নিন,' রানাকে বলল বৃদ্ধ। 'অনেক দূর থেকে, অনেক বিপদ এড়িয়ে এখানে পৌঁছেছেন—সবাই খুব ক্লান্ত। পরে আমরা খাওয়া-দাওয়া করব কথা হবে। এখন বিশ্রাম।' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল লোকটা।

'কিন্তু আমার তো সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে!' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল শ

'ভাল ভাল খাবারের স্বপ্ন দেখো,' বলে মাটির মেঝেতে সটান শু

রানা।

একটু পরেই নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়ল সবাই।

অস্তগামী রক্তলাল সূর্যের মাথায় ঘন কালো মেঘ জমেছে। একটা টিনের চালের নিচে শমি আর গিল্টি মিয়াকে নিয়ে বসে রয়েছে রানা, চালের চারদিকে চারটে খুঁটি আছে, কোন দেয়াল নেই। ওদের চারপাশে, নোংরা মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে পাঁচ-সাতজন নারী-পুরুষ। ওদের মাঝখানে বসেছে পঞ্চায়েত-প্রধান নটরাজন পেয়ারেলাল। সে-ও আরেক প্রাচীন বুড়ো, চুল-দাড়ি সব সাদা, চেহারায় বয়ে বেড়াচ্ছে গ্রামবাসীর দুঃখ-বেদনার ছাপ। সন্ন্যাসীর আরও একটা পরিচয় পাওয়া গেল—সে এই গ্রামের একজন ওঝা; তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে রোগ-বালাইয়ের চিকিৎসা তো করেই, মন্দিরের পুরোহিতও। নাম দেবলিঙ্গম।

পঞ্চায়েত-প্রধানের নির্দেশে মহিলারা শুধু অতিথিদের সামনে তামার বাসন রেখে গেল।

শমির চোখ-মুখ প্রত্যাশায় জ্বলজ্বল করছে। 'এইবার, এইবার মনে হচ্ছে ডিনার পরিবেশন করবে।'

বলতে না বলতে একটা গামলা থেকে ধূমায়িত ভাত ঢালা হলো বাসনগুলোয়, সঙ্গে লবণ দেয়া কচু সেদ্ধ—ব্যস, আর কিছু না।

আশাহত শমির চোখে অভিমান। 'এ আমি খেতে পারব না।'

'এরা সবাই মিলে এক হপ্তায় যা খায়, তারচেয়ে বেশি খাবার দেয়া হয়েছে এখানে,' বলল রানা। 'আমাদেরকে খাওয়াতে হচ্ছে বলে ওরা দিন কয়েক না খেয়ে থাকবে।'

শমি তবু বাসনে হাত দিচ্ছে না। 'আমার খিদে নেই।'

গ্রামের বয়স্ক লোকজন ওদের আচরণ লক্ষ করছে।

তাদের উদ্দেশে মৃদু হাসল রানা, তারপর শমিকে বলল, 'ওদেরকে তুমি অপমান করছ, আর আমাকে ফেলছ বিড়ম্বনায়। খাও!'

খাবারের দিকে তাকিয়ে চোখে এবার পানি চলে এলো শমির। পঞ্চায়েত-প্রধানকে রানা ব্যাখ্যা করল, 'আমার সঙ্গিনী তোমাদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে কাঁদছে।'

কষ্ট হলেও কচু ভর্তা দিয়ে ভাত ক'টা খেলো শমি। রানা ও গিল্টিমিয়াও খেলো।

পঞ্চায়েত-প্রধান হঠাৎ হিন্দীতে বলল, 'রওনা হবার আগে আপনারা এখানে বিশ্রাম নিন।'

একটু আধটু হিন্দী গিল্টি মিয়াও বোঝে। সে-ও ভাঙাচোরা হিন্দীতে বলল, 'আমরা দিল্লি হয়ে ঢাকা যাব তো, তাই বিশ্রাম নেয়ার বেশি সময় নেই।'

'আসলে আমাদের একজন গাইড দরকার,' পঞ্চায়েত-প্রধান নটরাজনকে বলল রানা। 'কাছাকাছি রেল স্টেশন বা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিলেই হবে। আমার সঙ্গী যাবে ঢাকায়, আর আমরা দু'জন যেতে চাই নতুন দিল্লি।'

'এ-সব কোন সমস্যা নয়। চিন্নবর আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে,'

আশ্বস্ত করল নটরাজন।

'ধন্যবাদ।' রানা খুশি।

এবার মুখ খুলল ওঝা, তথা মন্দিরের পুরোহিত দেবলিঙ্গম, 'ঢাকা বা [illegible] যাবার আগে আপনারা একটু চৌপল হয়ে যাবেন।'

রানা টের পেল এইবার আলোচনার বিষয়বস্তু বদলে যাচ্ছে। [illegible] চৌপলঘাট তো ঢাকা বা দিল্লির উল্টো দিকে।'

'ওখানে, চৌপল প্রাসাদে ঢুকতে হবে আপনাকে,' বলল দেবলিঙ্গম, [illegible] কথা যেন সে শুনতেই পায়নি।

রানা অন্য কৌশল ধরল। 'এদিকের ইতিহাস আমার যতটুকু স্মরণ [illegible] প্রায় দেড়শো বছর ধরে চৌপল প্রাসাদ খালি পড়ে আছে। কেউ পারে [illegible] ওখানে কেন যেতে হবে আমাকে?'

দেবলিঙ্গম মাথা নাড়ল। 'ওখানে এখন কাপালি আর ঠগীদের একজন [illegible] মহারাজা বাস করছে। তার প্রাসাদে কালো আলোর অশুভ খেলা চলছে [illegible] প্রাসাদই তো আমাদের গ্রামটা শেষ করে দিয়েছে।'

কথার খেই ধরে রাখতে সমস্যা হচ্ছে রানার। 'ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে [illegible] খুলে বলো দেখি এখানে আসলে কি ঘটেছে।'

দেবলিঙ্গম ধীরে ধীরে বলে গেল, যেন কোন শিশুর সঙ্গে কথা বলছে [illegible] 'অমঙ্গল আর অকল্যাণ শুরু হলো চৌপলঘাট প্রাসাদ থেকে। তারপর [illegible] বর্ষণের মত ওখান থেকে চারপাশের গোটা তল্লাটে অমঙ্গলের অন্ধকার [illegible] পড়ল।'

'কিসের অমঙ্গল? কী অকল্যাণ?'

'ওরা এসে আমাদের গ্রাম থেকে শিবলিঙ্গ নিয়ে চলে গেল।'

'মা! মা!' চোখ বুজল শমি। দু'হাত এক করে বুকের মাঝখানে [illegible] বিড় বিড় করছে। 'ভগবান! ভগবান!'

'শিবলিঙ্গ হলো পবিত্র একটা শক্তি,' ব্যাখ্যা করল দেবলিঙ্গম [illegible] আমাদের গ্রামকে সব রকম রোগ-শোক আর আপদ বালাই থেকে রক্ষা [illegible] রানার দিকে আঙুল তাক করল সে। 'সেজন্যেই তো শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে [illegible] এনেছেন।' তার এই শেষ কথায় 'ঋষেত-প্রধান নটরাজন সহ [illegible] গ্রামবাসী সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

রানা ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ রাখতে রাজি নয়, বলল, 'না [illegible] এখানে আমাদেরকে আনায়নি। আমাদের প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

'না।' দেবলিঙ্গম ধৈর্যশীল একজন শিক্ষকের মত রানার ভুল ভাঙাবার [illegible] করল, ও যেন মাথামোটা এক ছাত্র। 'আমরা প্রার্থনার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] আমাদের শিবলিঙ্গ যেন আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ [illegible] থেকে ফেললেন আপনাকে। কাজেই এখন আপনি চৌপলঘাটে গিয়ে শিবলিঙ্গ এনে দেবেন।'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ চোখ পড়ল পথ [illegible] নটরাজনের করুণ মিনতিভরা দৃষ্টি আর দুঃস্থ গ্রামবাসীদের [illegible]

চেহারার দিকে। কুসংস্কার, ধর্মীয় আচার, জড়পদার্থের অলৌকিক ক্ষমতা ইত্যাদি কিছুই রানা বিশ্বাস করে না; তারপরও মানব গোষ্ঠির বিভিন্ন স্তরে যে-সব ধর্মীয় রীতিনীতি প্রচলিত রয়েছে সেগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর উদারতা মুক্তবুদ্ধির চর্চা আর সুশিক্ষা থেকেই পেয়েছে ও।

গোধূলি শেষে স্বপ্নপুরী গ্রামে অন্ধকার নেমে এলো। পঞ্চায়েত-প্রধান নটরাজন পথ দেখিয়ে গ্রামের শেষপ্রান্তে নিয়ে এলো ওকে, পিছু নিয়ে আসছে বুড়ো-বুড়ি, তরুণ-তরুণী, দেবলিঙ্গম ও অতিথিরা। মশাল জ্বালা হলো। শোকে মাতম করার প্রলম্বিত সুরে কুকুরগুলো ডাকছে। তারাগুলো মিটমিট করছে, তবে মনে হলো অনেক দূরে।

একতলা একটা বাড়ির সমান বোল্ডারটা। ওটার সামনেই থামল সবাই। গম্বুজ আকৃতির ছোট একটা অংশ পাথরটা থেকে কেটে নেয়া হয়েছে। গিল্টি মিয়া সারাক্ষণ রানার গা ঘেঁষে থাকছে। 'সার, যা বলচে সত্যি নাকি?' ফিসফিস করল সে। 'ওরা আমাদের পেলেন ফেলে দিল? একানে আপনাকে আনবার জন্যে?'

'এটা ওদের কুসংস্কার, গিল্টি মিয়া। স্রেফ একটা ভৌতিক গল্প। এ নিয়ে তোমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।'

'কি যে বলেন না, সার! আমি ভয় পাব ভূতকে? ওরাই বরং আমাকে দেকলে ভয়ে পালাতে দিশে পায় না...'

তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'তুমি দেখছি আরেকটা ভূতের গল্প বানাচ্ছ।' নটরাজনের দিকে তাকাল ও। 'শিবলিঙ্গটা ওরা এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে?'

দেবলিঙ্গম জবাব দিল, 'হ্যাঁ। ওরা বলল, ওদের ঈশ্বর হলো শয়তান। বলল, আমাদেরকেও সেই শয়তানের পূজা করতে হবে। আমরা বললাম—রাম রাম, প্রাণ থাকতে নয়।' মশালের লালচে আলোয় তার চোখের জলকে রক্তের ফোঁটার মত লাগছে।

'কিন্তু ওরা শিবলিঙ্গ নিয়ে যাওয়ায় গ্রামটা কেন ধ্বংস হলো?'

ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করল মন্দিরের পুরোহিত দেবলিঙ্গম। 'পবিত্র পাথর নিয়ে চলে যাবার পর গ্রামের সব ক'টা কুয়া শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেল। তারপর নদীর পানি শুকিয়ে গেল, তলায় শুধু বালি চিকচিক করে।'

'খরা?'

প্রবলবেগে মাথা নাড়ল দেবলিঙ্গম। 'না!'

'তাছাড়া, আমরা তো নদীতে যথেষ্ট পানি দেখলাম...'

দেবলিঙ্গম কাঁদতে কাঁদতে হেসে উঠল। 'এটাই তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কেরামতি, মহাশয়! আপনারা আকাশ থেকে পড়বেন বলে তিনি হঠাৎ করে নদীতে জল ভরে দিলেন।'

রানা বলল, 'শিবলিঙ্গ ছিনতাই হবার পর আর কি ঘটল?'

'আমাদের ধান গাছ, ফল গাছ, পোষা পশু-পাখি—সব মাটিতে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। এক রাতে সবগুলো খেতে একযোগে আগুন লাগল। সবাই ছুটলাম

আগুন নেভাতে। ফিরে এসে দেখি গ্রামের কারও বাড়িতে কোন শিশু-কিং নেই। শুধু অন্ধকারে বসে মেয়েরা কাঁদছে।'

'এর অর্থ?'

'তাও আবার জিজ্ঞেস করতে হয়!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেবলিঙ্গম। 'শয়তান-উপাসকরা ছেলেমেয়েদের চুরি করে নিয়ে গে ওদেরকে একে একে বলি দেয়া হবে।'

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ফেলল শমি।

গিল্টি মিয়া অনুভব করল তার বুকের ভেতর একটা কষ্ট মোচড় খাচ্ছে

'শুধু ওরাই নয়, আশপাশের সবকটা গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে গেছে কয়েকশো শিশু!' টপ করে আর একফোঁটা পানি পড়ল পুরোহিতের থেকে।

কথা বলবার আগে রানাকে গলাটা পরিষ্কার করে নিতে হলো। দুঃখিত। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না আমি কিভাবে সাহায্য করতে পা বুঝতে রানা চায়ও না। ওর মন বলছে, গোটা ব্যাপারটার মধ্যে খারাপ একটা কিছু আছে যা ওর স্পর্শ করা উচিত নয়। 'তোমরা বরং কাছাকাছি সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কথা পুলিসকে জানাও।'

'পুলিস ওদের পয়সা খেয়ে আমাদেরকে উল্টে ভয় দেখিয়ে শাসিয়ে যায়

'সেক্ষেত্রে বি.এস.এফ-কে খবর দেয়া উচিত।'

'বিচ্ছিন্নবাদীদের ঠেকাবার জন্যে একশো কিলোমিটার দূরে সেনা বসানো হয়েছে,' জানাল দেবলিঙ্গম। 'আমাদের অভিযোগ পেয়ে ওখান থে প্রায়ই সৈনিকরা তদন্ত করতে আসে। কিন্তু তারা কিছুই খুঁজে পায় না। পারে করে! শয়তানের পূজা, নরবলি ইত্যাদি সবই তো গভীর রাতে অতি সংগো সারা হয়।'

'সবাই যেখানে ব্যর্থ, সেখানে আমি একা কিছু করতে পারব, তোমাদের ধারণা হলো কেন?'

দেবলিঙ্গম এক গাল হেসে বলল, 'কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আপনাকে সাহ করবেন। এই যে এখানে আপনি পৌঁছেছেন, এটা আপনার নিয়তি, মহাশয় আর ওদের শয়তান, সে-ও জানে যে এখানে আপনি পৌঁছেছেন। সে এ জানে যে আপনার হাতেই তার বিনাশ লেখা রয়েছে।'

নিজেদের পাথুরে ঘরে শুয়ে আছে ওরা। কাপালি আর ঠগীদের নাম শুনে আতংকিত। তবে একশোর মত ছেলে-মেয়েকে বলি দেয়ার জন্যে আটকে হয়েছে, তাদের মুক্ত করা একটা মানবিক দায়িত্ব—রানার এই যুক্তির একমত না হয়েও পারল না সে। গিল্টি মিয়া জানাল, 'এয়েচি যকন, কিছু করা দরকার। আর যদি বিপদ হয়, আপনি তো আচেনই।'

এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল রানা। কি দেখেছে মনে করতে পা তবে একটা শব্দ এখনও শুনতে পাচ্ছে। শুকনো ঝোপ-ঝাড় ভেঙে

একটা ছুটে আসছে। নিঃশব্দে উঠে বসল ও। কান পেতে শুনছে।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা। একবার দেখে নিল, শমি আর গিল্টি মিয়া মড়ার মত ঘুমাচ্ছে। নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ও।

বাতাসের হাহাকার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। চাঁদ বিরাট একখানা চকচকে একটাকার কয়েন। ওর বাঁ দিকের ঝোপ থেকে আবার শুকনো ডাল ভাঙার আওয়াজ ভেসে এলো। ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকাল রানা। হঠাৎ ঝোপটা থেকে একটা শিশু বেরুল। ছুটে সরাসরি ওর দিকেই আসছে।

রানা মাটিতে হাঁটু গাড়ল। ওর প্রসারিত বাহুর ভেতর ঢুকে পড়ল বাচ্চাটা। বলা যায়, আছাড় খেয়ে পড়ল। পড়েই জ্ঞান হারিয়েছে। সাত কি আট বছর বয়স হবে, খেতে না পেয়ে শুকিয়ে পাটখড়ি হয়ে গেছে। গায়ে শতচ্ছিন্ন, নোংরা একটা কম্বল। সারা পিঠে চাবুকের ক্ষত।

সাহায্যের জন্যে হাঁক ছেড়ে ছেলেটাকে বুকে করে নিজেদের ঘরে নিয়ে এলো রানা, শুইয়ে দিল একটা চাদরে। কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রামের বয়স্ক নারী-পুরুষরা ভিড় করল ওখানে। হ্যাঁ, একবাক্যে জানাল সবাই, এই বাচ্চা তাদের গ্রামের। দেবলিঙ্গম কিছু মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিল ছেলেটার গায়ে, ভেজা কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিল চোখ-মুখ। চোখ মেলে তাকাল ছেলেটা। একে দেখছে, ওকে দেখছে, সবশেষে তার দৃষ্টি রানার ওপর আটকে গেল। তারপর শুধু রানার উদ্দেশে, আর কারও উদ্দেশে নয়, একটা হাত তুলল সে।

হাতটা ধরল রানা। আঙুলগুলোয় ক্ষত দেখল ও। প্রতিটি নখ ভাঙা। হাতের শক্ত মুঠোয় কি যেন ধরে আছে সে। মুঠোটা ঢিল হলো। রানার হাতে কি যেন গুঁজে দিল সে। তার ঠোঁট নড়ে উঠল, কি বলছে কোন রকমে শোনা গেল। 'শিবশঙ্কর!'

তার মা ছুটে এলো। কলজের টুকরোকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল বুকে। মা ও ছেলে, দু'জনেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে শমি ও গিল্টি মিয়া। কারও মুখে কথা নেই।

মুঠো খুলে জিনিসটা দেখল রানা। ছেঁড়া-ফাটা এক টুকরো কাপড়, মিনিয়েচার পেইন্টিঙের পুরানো একটু টুকরো। 'মহা ঋষি!' বিড়বিড় করল ও।

ছয়

ভোর হলো খুব তাড়াতাড়ি।

গ্রামের পথ ধরে দ্রুত পায়ে হাঁটছে রানা, শেষ মুহূর্তে জরুরী কিছু বুদ্ধি-পরামর্শ নিচ্ছে প্রবীণ গ্রাম [illegible]দের, ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে হাঁপিয়ে উঠছে তারা। গ্রামের ঠিক [illegible] প্রকাণ্ড একজোড়া হাতি অপেক্ষা করছে।

চিদম্বর, ওদের গাই[illegible] [illegible] একটা ভঙ্গিতে শমিকে ওই হাতি দুটোর একটার দিকে [illegible] [illegible] চেষ্টা করছে। 'না, বাবা, না! হাতির

পিঠে চড়া আমার কর্ম নয়।' ভয়ে বারবার শুধু পিছু হটছে শমি।

'কী আশ্চর্য, শমি! এরকম করলে রওনা হতে দেরি হয়ে যাবে যে!'

চিন্ময়বরের সাহায্যে হাতির পিঠে ওঠার সময় নিজেকেই শমি প্রশ্ন করল—কেন, কি আছে ওর মধ্যে? আদর বা আন্তরিকতার সঙ্গে কিছু বললে প্রতি অনুগত হয়ে পড়বার একটা প্রবণতা কেন দেখা দেবে তার ভেতর সোনালি ড্রেস এখনও হাতে, হাতির চওড়া পিঠে শক্ত হয়ে বসল সে, যাবার ভয়ে থরহরি-কম্প হলেও চেহারায় বেপরোয়া একটা ভাব ধরে রাখার চেষ্টা।

দেখা গেল, হাতি আসলে দুটো নয়, তিনটে। তৃতীয়টা শিশু হাতি, এক ঝোপের আড়ালে ঘাস খাচ্ছিল, গিল্টি মিয়ার মত হালকা বোঝা সহজেই বহন করতে পারবে। দ্বিতীয় গাইড আরোহী সহ সেটাকে শমির হাতির পাশে এনে এলো। এরপর দুই গাইড পথ দেখিয়ে গ্রাম থেকে বের করে আনল ওদের। গ্রামবাসীরা শোকে হোক বা অন্য কোন কারণে নিঃশব্দে চোখের পানি ফেলছে দেখে শমি মন্তব্য করল, 'এই প্রথম কাউকে দেখলাম যে আমাকে বিদায় জানাবার সময় কাঁদছে।'

দু'সেকেন্ড মাথা ঘামিয়ে গিল্টি মিয়া জবাব দিল, 'ভুল করচেন, সিস্টার। ওরা আপনার জন্যে কাঁদচে না। কাঁদচে হাতিগুলোকে চলে যেতে দেকে।'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে, বড়ভাই,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিল শমি।

'হাতির খোরাক যোগাবার ক্ষেমতা নেই ওদের, তাই বেচতে পাটাচ্চে। তা তো তাই বললেন আমাকে।'

এই সময় একটা শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই আরেক প্রকাণ্ড হাতির মাথায় রানাকে বসে থাকতে দেখল শমি। তারপরই চোখ পড়ল পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দেবলিঙ্গম আর নটরাজন সহ প্রবীণ গ্রামবাসীদের দিকে। জোড় করা দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে রানাকে বিদায় জানাচ্ছে তারা।

ওদের এগোবার গতি মন্থর, তবে সামনে কোন বাধা পড়ল না। প্রতি ঘণ্টায় দূরের পাহাড়গুলো আরও কাছে চলে আসছে। গ্রামের চারপাশে গাছপালা ছিল খুব কম। ওগুলোর সংখ্যা দু'পাঁচটা করে বাড়তে দেখা গেল। প্রচুর লম্বা ঘাস দেখা গেল। যত এগোচ্ছে, ঝোপগুলোকে দেখাচ্ছে ততই সবুজ। দু'চারটে ছোটখাট বন্যপ্রাণী চোখে পড়ল, তবে সবগুলোই বিপদসীমার বাইরে।

দুপুরের দিকে সূর্য হয়ে উঠল আকারে প্রকাণ্ড আর অত্যাচারে প্রচণ্ড। বাতাস আগুনের মত গরম। চলার পথে কোথাও এতটুকু ছায়া পাওয়া গেল না। রানার শার্ট ও ট্রাউজারের ভেতর দরদর করে ঘামছে শমি। কাপড়গুলোয় ধুলো জমেছে। শমি ভাবছে, নিজের এই অধঃপতন কি তার মেনে নেয়া উচিত হচ্ছে? হাতের সোনালি ড্রেসটার দিকে তাকাল। মাত্র গতকালই সে ছিল ছোট একটা শহরের নামকরা গায়িকা ও নাচিয়ে—সত্যিকার একজন সেলেব্রিটি। হঠাৎ মনে পড়তে সোনালি ড্রেসের একটা পকেট থেকে অত্যন্ত দামী ফ্রেঞ্চ পারফিউমের ছোট্ট একটা শিশি বের করল সে, গলায় ও দুই কানের পিছনে স্প্রে করল

কিছুটা।

রানা প্রায় সারাটা দিনই হাতির পিঠে বসে ঝিমিয়ে কাটাল। গিল্টি মিয়ার সময় কাটল শিশু হাতির সঙ্গে গল্প করে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, বাচ্চা হাতিটার ঘন ঘন মাথা ঝাঁকানো দেখে মনে হলো, গিল্টি মিয়ার ভাষা বেশ ভালই বুঝতে পারছে সে।

শেষ বিকেলের দিকে পরিবেশ অনেকটাই বদলে গেল। অসংখ্য গাছপালার শাখা-প্রশাখা ওদের মাথার একশো ফুট ওপরে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে সবুজ শামিয়ানা তৈরি করেছে, এত পুরু যে ভেতরে রোদ ঢুকতে পারছে না। এদিকে রাবার বাগানের ছড়াছড়ি। আম-কাঁঠাল-জামরুল থেকে শুরু করে পরিচিত প্রায় সব রকম ফলের গাছই চোখে পড়ছে। এমনকি একটা পথও খুঁজে পাওয়া গেল। যদিও সে পথের কোথাও শুকনো ভাঙা ডাল পড়ে আছে, আবার কোথাও পথের ওপর সরে এসেছে কিছু শাখা। কর্মঠ গাইডরা দ্রুত সব বাধা দূর করল।

পথের শেষে অগভীর একটা নদী পড়ল। রানার অনুমতি নিয়ে চিন্ময়বর মিছিল নিয়ে নেমে পড়ল পানিতে। চিন্ময়বরের হাঁটুও ডুবছে না। তার পিছনে রয়েছে গিল্টি মিয়ার বাচ্চা হাতি। ত্রিশ গজের মত এগোবার পর অদ্ভুত একটা শব্দ শুনতে পেল গিল্টি মিয়া, তারপর গাছপালার ডাল ঝাঁকি খেলো। 'স্যার, দেকুন!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

রানা ও শমি চোখ তুলতেই বিশাল ডানা সহ কয়েকশো অদ্ভুত প্রাণী দেখতে পেল গোধূলির ম্লান আকাশে।

'ওমা! পাখি এত বড় হয়?'

চিন্ময়বর কি যেন বলল রানাকে, রানা জানাল, ওগুলো আসলে প্রকাণ্ড আকারের বিশেষ এক ধরনের বাদুড়-এক ডানা থেকে আরেক ডানা পর্যন্ত ছ'ফুটের কম নয়। চিন্ময়বর বলছে, 'এগুলো আসলে অশুভ আত্মা।'

কুঁকড়ে আরও ছোট হয়ে গেল গিল্টি মিয়া। ড্রাকুলা ছবিটা দু'বার দেখেছে সে। বিশেষ এক ধরনের বাদুড় বলতে কি বোঝায় তার জানা আছে।

বাদুড়গুলোকে বিরক্ত করা হবে, এই ভয়ে কোন কথাই বলল না শমি। সে-ও এই প্রাণীগুলোকে ভীষণ ভয় পায়।

নদী থেকে তীরে ওঠবার সময় হাতি তিনটের শখ হলো একটু খেলবে। তাদের সেই শখ আরোহীদের কাছে মনে হলো পাগলামি। রানা, শমি ও গিল্টি মিয়াকে পানিতে ফেলে দিল তারা-তবে ছুঁড়ে নয়, হড়কে। ভিজে গেলেও তীরে উঠতে কারও কোন সমস্যা হলো না। রানা সিদ্ধান্ত নিল এখানেই ক্যাম্প ফেলা হবে।

খানিক পর রানাকে নদীর কিনারা ধরে হাঁটতে দেখা গেল, শমিকে খুঁজছে, নিশ্চিত হতে চায় সে নিরাপদে আছে কিনা। শমিকে নয়, নদীর ওপর ঝুলে থাকা একটা গাছের ডালে তার কাপড়চোপড় শুকাতে দেখল ও। এক মুহূর্ত পর শমিকেও দেখতে পেল, ডালটার সামনে পানিতে সাঁতরাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে ওর গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ। 'এই, শমি, শুনছ! এবার বোধহয় তোমার পানি

ছেড়ে উঠে আসা উচিত।'

রানার আকস্মিক উপস্থিতি চমকে দিয়েছে শমিকে। তবে নিজেকে সামলে নিল দ্রুত। এ-ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি অন্তত কয়েকশো বার হতে হয়েছে তাকে। 'জন্মদিনের পোশাক পরে?' বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করল সে। 'আহা বলিহারি!'

'আহা, উঠে এসে গা মোছো। ঠাণ্ডা লাগবে যে!'

'দেখো মশাই, আমাকে যদি তোমার সিডিউস করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে অ্যাপ্রোচটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের হয়ে যাচ্ছে।'

'আমি? তোমাকে সিডিউস করতে চাই? আশ্চর্য তো! তোমার কাপড়চোপড় আমি খুলেছি, না তুমি?' কাঁধ ঝাঁকানোর ভাষা দিয়ে আগ্রহের অভাব প্রকাশ করল রানা। 'আমি শুধু জানাতে এসেছিলাম এদিকের অচেনা পানিতে কি আছে তা হয়তো তোমার জানা নেই।'

'ভয় দেখিয়ে কোন লাভ হবে না।' হাসল শমি। 'এখানে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করছি। কি আছে?'

'জোঁক-টোক থাকতে পারে, কিংবা—'

জোঁকের কথা শুনে হুড়মুড় করে উঠে আসতে যাচ্ছিল শমি, কোমর পানিতে এসে আবার ডুব দিল।

'জোঁক আমি ডরাই না!' বলল ও ভয়ে ভয়ে।

'সেক্ষেত্রে আমার কিছু বলবার থাকতে পারে না,' চরম নির্লিপ্ত একটা ভাব ধরে রেখে বলল রানা। 'আমি ক্যাম্পে ফিরছি।'

গভীর জঙ্গলের ভেতর রাত নামল ঝপ করে। ক্যাম্পফায়ার উষ্ণ আলো ছড়িয়ে দিল, কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ কমলা আভার ঠিক বাইরেই ছায়াগুলো বড় বেশি কালো আর সন্দেহজনক।

চিন্ময়বর হাতিগুলোকে খাওয়াচ্ছে। বাকি গাইডরা গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। শমির গায়ে একটা চাদর জড়ানো, আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে কাপড় নিঙড়াচ্ছে। কয়েক ফোঁটা পানি ইচ্ছে করেই রানার পিঠেও ফেলল, তারপর একটা নিচু ডালে শুকাতে দিল সেগুলো। শেষ কাপড়টা অন্য একটায় ঝোলাতে গিয়ে নিজের অজান্তে একটা দৈত্যাকার বাদুড়ের ভাঁজ খুলে ফেলল সে।

তার আর্তচিৎকার শুনে সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, রানা বাদে। ও শুধু চোখ-মুখ কোঁচকাল। বাদুর ডানা ঝাপটাচ্ছে, নখর দিয়ে আঁচড়াতে চাইছে। আতংকে পিছু হটল শমি, ঘুরল, ঘুরেই মুখোমুখি হলো একটা হনুমানের। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে শমিকে ভয় দেখাল হনুমানজী। আবার চিৎকার ছাড়ল শমি, ঘুরে আরেক দিকে ছুটল। এবার অন্ধের মত। নরম অথচ নিরেট, এরকম কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেলো সে। জিনিসটা অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরছে তাকে। বাধ্য হয়ে চোখ মেলল, আবার চিৎকার দেয়ার জন্যে তৈরি। দেখল রানার আলিঙ্গনের ভেতর আটকা পড়েছে। 'তুমি! তুমি?'

'ডুবে মরার জন্যে নদীর দিকে ছুটছিলে, ভাবলাম চেষ্টা করে দেখি বাঁচানো

যায় কিনা।'

'এই মুহূর্তে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও!'

'দিলাম,' বলে শমিকে বাহুমুক্ত করল রানা, তাকে আগুনের ধারে ফিরে যেতে দেখে বলল, 'এত বড় একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিলাম–একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত না!'

ঘাড় ফিরিয়ে ঠোঁট বাঁকাল শমি। কণ্ঠস্বর একাধারে টক-ঝাল-মিষ্টি, 'যদি কিছু পাওনা হয়ে থাকে, সহস্রগুণ বেশি আদায় করে নিয়েছ।'

আবার ক্যাম্পফায়ারের পাশে ফিরে এসে বসল ওরা, গিল্টি মিয়ার দু'পাশে। খানিক পর পকেট থেকে এক টুকরো কাপড় বের করে ভাঁজ খুলল রানা। এটা স্বপ্নপুরীতে সেই বাচ্চা ছেলেটা দিয়েছিল ওকে।

'জানতে পারি, জিনিসটা আসলে কি?' জিজ্ঞেস করল শমি, কিভাবে যেন ধীরে ধীরে গিল্টি মিয়াকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গাটা দখল করে নিয়েছে সে।

'এটা পুরানো একটা পাণ্ডুলিপির টুকরো। এই পিকটাগ্রাফ একজন মহাঋষির প্রতিনিধিত্ব করছে। জিনিসটা কয়েকশো বছরের পুরানো। সাবধানে ধরো, সাবধানে!'

রানার হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে শমি। লাল, সোনালি ও নীল রঙে আঁকা বরদানের দৃশ্য। গিল্টি মিয়া তো বটেই, এমনকি বাচ্চা হাতিটাও প্রাচীন ইতিহাস স্বচক্ষে দেখার জন্যে শমির ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। 'ভাষাটা সংস্কৃত,' ওদেরকে বলল শমি। 'এখানে লেখা রয়েছে, একজন পুরোহিত বা ঋষি কৈলাস পর্বত আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেখানে তিনি শঙ্কর বা শিব-এর সাক্ষাৎ পান।'

একটু থামল শমি।

'কিন্তু রানা, সব লেখার অর্থ আমি ধরতে পারছি না। আমার সংস্কৃত খুব একটা ভাল নয়। এই ছবিতে ঠিক কি ঘটছে বলো তো? ঋষিকে কি যেন দিচ্ছেন শিব। কি?'

'পাথর। শিব তাঁকে উপদেশ দেন, পাহাড় থেকে নেমে অমঙ্গল আর অকল্যাণের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সেই লড়াইয়ে সাহায্য পাওয়ার জন্যে পাঁচটা পবিত্র পাথর দেন তিনি। বলেন, পাথরগুলোর অলৌকিক ক্ষমতা আছে।'

'আমি জন্মেছি হিন্দুর ঘরে, তবে এ-সব অলৌকিক ক্ষমতা-টমতায় একদমই বিশ্বাস করি না,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল শমি। 'আমার বাবা বেনেগাল মশাই ব্যবসাতে মার খেয়ে সন্ন্যাসীদের কাছে আসা-যাওয়া শুরু করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল সন্ন্যাসীদের অলৌকিক ক্ষমতা তাঁর ব্যবসা আবার ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু যখন দেখা গেল তা ঘটছে না, তিনি মা আর আমাদের দুই ভাই বোনকে অসহায় অবস্থায় রেখে আত্মহত্যা করলেন। গুড নাইট, মাসুদ রানা। তুমি ম্যাজিক্যাল রক নিয়ে গবেষণা করো, আমি ঘুমাতে চললাম।' কাপড়ের টুকরোটা রানার হাতে গুঁজে দিয়ে ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় গিয়ে চাদর মেলল সে।

'তুমি ওখানে শোবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি ভেবেছিলাম সবাই

আমরা কাছাকাছি শোব। মানে, নিরাপত্তার জন্যে আর কি।' কথাগুলো বলার সময় শমির দিকে তাকাল না ও, তাকালে বেশি আগ্রহ দেখানো হয়ে যাবে।

শমিও তাই করছে, তাকাবার প্রবল ইচ্ছেটাকে এতটুকু প্রশ্রয় দিচ্ছে না। সে ভাবছে, আমাকে ভাল লেগে থাকলে মুখ ফুটে সেটা বলতে পারছে না ও? কি চায় সরাসরি না বললে, সে লোককে বিশ্বাস করা তার পক্ষে কঠিন। 'দেখো মশাই, তোমার চেয়ে একটা সিংহের পাশে শুতেও আমি বেশি নিরাপদ বোধ করব।'

ঠিক সেই মুহূর্তে অতিকায় একটা অজগর শমির পিছনের গাছ থেকে নেমে এলো। সাপটা শমির দিকে এগোচ্ছে দেখে দাঁড়াতে গেল গিল্টি মিয়া, কিন্তু পা দুটো তাকে সাহায্য করল না–ওগুলো যেন কাদার তৈরি। তার থেকে কাতর বিলাপের মত আওয়াজ বেরুল, 'কামড়েচে বলে ককনও শুনি আস্ত গিলে ফেলে...'

সামনে এগোচ্ছিল রানা, কিন্তু সবার দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছনে তাকিয়ে বিকট এক চিৎকার ছেড়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল শমি রানার বুকে। দৌড়ঝাঁপ দেখে ভড়কে গেল অজগর, বার দুই লকলকে জিভ বের করে বোঝার চেষ্টা করল পরিস্থিতিটা, তারপর চলে গেল জঙ্গলের দিকে।

নিজেকে রানার বুক থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কটমট করে চাইল শমি রানার দিকে। বলল, 'এই জঙ্গল বিশ্রী লাগছে আমার।'

দূরে, তবে বেশি দূরে নয়, নদীতে জল খেতে এসে গর্জে উঠল একটা বাঘ। চাদরটা তুলে আনার সাহসও হারিয়েছে শমি ততক্ষণে। রানা ওটা এগিয়ে দিতে ঝটপট শুয়ে পড়ল আগুনের ধারে।

অনেক রাত পর্যন্ত একটা উঁচু পাথরের ওপর একা পাহারায় বসে থাকল রানা। মাঝে-মধ্যে নিচে নেমে আগুনটায় শুকনো কাঠ গুঁজে দিল। মাঝরাতের পর গিল্টি মিয়াকে পাহারায় রেখে শুয়ে পড়ল ও আগুনের আরেক পাশে।

ভোরবেলা ক্যাম্প গুটিয়ে আবার রওনা দিল ওরা। গিল্টি মিয়া ও শমি যে হাতির সঙ্গে গল্প করে পথের ক্লান্তি খানিকটা হলেও কমাতে পারল। বেশ গড়াচ্ছে, গাইডদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করল রানা। কিন্তু প্রশ্ন করে সদুত্তর পেল না।

তারপরে, ঠিক দুপুরবেলা, গাছপালার ফাঁক দিয়ে পাহাড়ের মাথায় পাথরের তৈরি টকটকে লাল বিশাল প্রাসাদটা দেখতে পেল ওরা।

চৌপল প্রাসাদের নিচে পৌঁছাতে আরও দেড় ঘণ্টা সময় লাগল। প্রথমে ছোট একটা গিরিখাদে ঢুকতে হবে, সেখান থেকে ধাপ বেয়ে পাহাড়-পেঁচানো পথ ধরে উঠতে হবে ওপরে। এই গিরিপথে ঢোকার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল চিঙ্গবর। চিৎকার করে বাকি গাইডদের সাবধান করল, 'খবরদার! কেউ সামনে এগিয়ো না!'

হাতি থেকে নেমে তার কাছে ছুটে এলো রানা। 'কেন, কি হলো?' চিঙ্গবরের দৃষ্টি অনুসরণ করে ভয়াবহ, বিকটদর্শন মূর্তিটা দেখতে পেল

হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত সব ক'জন গাইড ইতিমধ্যে বিড়বিড় করে বলতে শুরু করেছে, 'বিপদ! সর্বনেশে বিপদ। মহাবিপদ!'

গিরিপথে ঢোকার মুখে পাহারা দিচ্ছে দশ মাথা বিশিষ্ট এক শয়তান। ওই মূর্তির সন্ধান কোন ধর্মগ্রন্থে বা ধর্মচর্চায় পাওয়া যাবে না। কোন বিকৃত মস্তিষ্কের অনুর্বর, অশুভ, অশ্লীল ফসল এটি। দশটা মুখ থেকে লালা ঝরছে। আধ হাত করে বেরিয়ে থাকা দশটা জিভে মরা পাখি, বিড়াল, পেঁচা, মানুষের মাথার খুলি ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মূর্তির প্রতিটি হাতে একটা করে কাটা মুণ্ডু, মুণ্ডগুলো থেকে লাল রক্ত ঝরছে। পুরুষ মূর্তিটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

গিল্টি মিয়া আর শমিও হাতির পিঠ থেকে নেমে মূর্তিটার দিকে এগোল। কিন্তু রানা তাদেরকে নিষেধ করল এগোতে। এই সময় ঘটল ব্যাপারটা। গাইডরা তাদের হাতি ঘুরিয়ে নিয়ে প্রায় ছুটে পালাচ্ছে। দেখতে পেয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার জুড়ে দিল শমি। 'এই! করো কি! তোমরা পালাচ্ছ কেন? আমরা ফিরব কিভাবে?'

রানা অবশ্য সম্পূর্ণ শান্ত। বলল, 'চেঁচিয়ে কোন লাভ নেই, শমি। ওরা ভয় পেয়েছে, কাজেই আর সামনে যাবে না। এখান থেকে হাঁটব আমরা।'

শেষ বিকেলের দিকে মসৃণ পাথর বসানো একটা রাস্তা পেল ওরা, উঁচু পাথুরে পাঁচিল ঘেঁষে এগিয়েছে। সবার পিছু নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কিছুদূর এগোল শমি, হাতে হাইহিল, দরদর করে ঘামছে, গজগজ করছে আপন মনে '...গোলাগুলির মধ্যে পড়লাম, প্লেন থেকে লাফ দিতে হলো। প্রায় ডুবেই মরছিলাম, হনুমানের ভেঙচি খেতে হলো, রক্তচোষা বাদুড় গলায় কামড় দিতে যাচ্ছিল; আমার গায়ে হাতির গন্ধ...' হঠাৎ উপলব্ধি করল তার শরীরে শক্তি বলে কিছু অবশিষ্ট নেই, তারপরই ওদের পিঠের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'সত্যি বলছি, দেখো, আমার পক্ষে আর একপা এগোনো সম্ভব নয়!'

থামল রানা, ঘুরে শমির কাছে ফিরে এলো। ঝাঁঝের সঙ্গে কিছু বলতে যাবে, বিদ্রূপাত্মক বা ছুরির ফলার মত ধারাল কিছু, এই সময় ওদের দু'জোড়া চোখ এক হলো। কারও চোখেই বানানো কোন গল্প নেই। নেই কৃত্রিম কোন ভাবাবেগ। রানা শমির চোখে কি দেখল ও-ই জানে, একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না। শমিও রানার চোখে কিছু একটা দেখেছে, তা না হলে দৃষ্টি ওরকম নিষ্পলক হবে কেন, কেনই বা হঠাৎ বোবা বনে যাবে সে।

নিঃশব্দে নিজের দুই বাহুতে শমিকে তুলে নিল রানা, বাকি দূরত্বটুকু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শমি বিস্মিত, হতভম্বও—তবে অসন্তুষ্ট নয়।

'আর কোন অভিযোগ?' জানতে চাইল রানা।

ক্ষীণ একটু নিঃশব্দ হাসি ঠোঁটে, শমি জবাব দিল, 'ও, হ্যাঁ। এই চিন্তাটা তোমার মাথায় আরও আগে কেন এলো না?' পৌরুষ আছে অথচ সত্যিকার ভদ্রলোক, এরকম আগে কাউকে বাহন হিসেবে পায়নি সে। এটা তার সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা, এবং কোনভাবেই বলা যাবে না যে খারাপ লাগছে।

পাঁচিল ঘেঁষা পাথুরে পথ ধরে বড় একটা গেটের সামনে এসে থামল ওরা।

এখানে শমিকে নামাল রানা। ধীরে ধীরে মুখের স্বাভাবিক রঙ ফিরে [illegible] 'অন্তত স্থায়ী কোন ক্ষতি হয়নি,' বলে একটু হাসল রানা।

শিরদাঁড়া টান-টান করল শমি, ঘুরল, তারপর কাঁধ থেকে টুপি [illegible] এই প্রথম দেখে চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, 'বলতে বিশ্বাস করবে না, [illegible] হাজারবার যে এরকম একটা প্রাসাদে বাস করার স্বপ্ন দেখেছি আমি।'

প্রাসাদটা সত্যি আশ্চর্য সুন্দর, মোগল ও রাজপুত স্থাপত্য রীতিতে [illegible] করা হয়েছে। অস্তগামী সূর্যের আলোয় লাল পাথর যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। তিন অভিযাত্রী ধীর পায়ে মার্বেল ব্রিজ-এর দিকে এগোল। এই সেতুর ওপারে প্রাসাদে ঢোকার প্রধান প্রবেশদ্বার।

সাত

প্রাসাদের প্রহরীরা ব্রিজের দু'পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের মুখে কঠোর গাম্ভীর্য, মাথায় কালো ও লাল পাগড়ি। ধুতি পরলেও, কতুয়ার নীচে কোমরে জড়িয়েছে চামড়ার চওড়া বেল্ট, সেই বেল্টের একপাশে একটা করে লম্বা চাবুক আর অন্যপাশে বড় আকারের ছোরা গোঁজা। ওরা তিনজন যখন যে প্রহরীকে পাশ কাটাচ্ছে, সে-ই 'অ্যাটেনশন' হচ্ছে, সেইসঙ্গে স্যালিউট করছে। প্রথম ভয়ে লাফিয়ে উঠলেও, সম্মান করা হচ্ছে বুঝতে পেরে ভারী খুশি হল শমি। সেই সঙ্গে তার সাহসেরও উন্নতি ঘটল। এই মুহূর্তে একটাই তার দুঃখ—ব্রিজে পা দেয়ার আগে হাইহিলটা পায়ে পরে নেয়া উচিত ছিল। তাহলে হয়তো আরেকটু বেশি মর্যাদা পাওয়া যেত।

প্রায় অন্ধকার একটা খিলান পেরুল ওরা, বেরিয়ে এলো ঝকঝকে উঠানে। কোয়ার্টজ আর মার্বেল-এর পাঁচিল, গম্বুজগুলো লাপিস লাজুলির, খিলান আকৃতির জানালায় রঙিন কাঁচ। সব কিছু এত সুন্দর যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিন্তু কোথাও কোন প্রাণের সাড়া নেই।

'হ্যালো?' গলা চড়িয়ে ডাকল রানা। দেয়ালে আর পাঁচিলে বাড়ি খেয়ে শব্দটা প্রতিধ্বনি তুলল।

তিনজন প্রকাণ্ডদেহী কাপালি বা বামাচারী হাজির হলো উঠানের উল্টো দিকটায়। তাদের কি জাত বোঝা বড় দায়। কপালে তিলক আছে, মাথায় জটা আছে, গলায় আছে শিশুদের খুলি দিয়ে তৈরি মালা। কোমরে চকচকে ভোজালিও রয়েছে। আর আছে কব্জিতে পেঁচানো একটা করে লম্বা চাবুক। লোকগুলো দারোয়ানও হতে পারে। কিংবা প্রাচীন ঠগীদের আধুনিক সংস্করণ।

'নমস্কার!' চিৎকার করে বলল শমি। জবাবে তার প্রতিধ্বনিই শুধু ফিরে এলো।

কয়েক মুহূর্ত পর ভোজালিধারী প্রহরীদের মাঝখান থেকে ধাপ বেয়ে নামতে দেখা গেল দীর্ঘদেহী, সাদা রঙের কমপ্লিট ইংলিশ সুট ও চমশা পরা

ভারতীয় এক লোককে। তার দৃষ্টিতে বিনয় যেমন আছে, তেমনি আছে সন্দেহ। শমির দিকে চোখ পড়তে ভুরু কোঁচকাল সে। পরে আছে শার্ট ও ট্রাউজার, অথচ হাতে হাইহিল ও সোনালি গাউন! এক্তুটুকুন গিল্টি মিয়াকে দেখে লোকটার চোখ লোভে যেন চকচক করে উঠল।

লোকটা হেঁটে এলো আমলাদের মত ব্যস্ততার ভান করে, কাছে এসে তিনজনকেই খুঁটিয়ে দেখল। 'আমি বলব, আপনারা হারিয়ে গেছেন, ঠিক?'

রানা মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। 'না, আমরা হারিয়ে যাইনি। ইনি শমিতা বেনেগাল, আর ইনি মিস্টার গিল্টি মিয়া। আমি মাসুদ রানা। ট্যুরিস্ট। দু'জন বাংলাদেশের নাগরিক। মিস শমিতা ভারতের।'

'আমি রাজ মালহোত্রা, চৌপলঘাটের মহামান্য প্রিন্সের প্রাইম মিনিস্টার, বলল লোকটা, ওদেরকে সম্মান জানিয়ে বাউ করল। 'চৌপল প্রাসাদে আপনাদেরকে স্বাগতম।'

উঠানের মাঝখানে এক প্রস্থ সিঁড়ি দেখা গেল, প্রাইম মিনিস্টার রাজ মালহোত্রা ওদেরকে পথ দেখিয়ে পিলারবহুল কয়েকটা হলঘরের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্দরমহলের প্রতিটি ঘর অত্যাধুনিক ও বিলাসবহুল আসবাবে সাজানো। চারদিকে অলংকৃত আয়নার ছড়াছড়ি। ছোট ছোট উঠানে রয়েছে হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি ফোয়ারা। ঝালর আর পর্দা দামী ব্রোকেড অথবা মখমল। একটা করিডর ধরে এগোবার সময় দেয়ালে চৌপল রাজপুরুষদের বংশানুক্রমিক প্রতিকৃতি ঝুলতে দেখল রানা। কি কারণে বলা মুশকিল, সাবেক মহারাজাদের চেহারা বিকৃত, বীভৎস, হিংস্র ও নৃশংস লাগল ওদের চোখে।

গিল্টি মিয়ার কানে ফিসফিস করল শমি। 'তোমার বস্ সম্ভবত জেনেশুনে বিষ করেছে পান। ওর ভুলে আমাদেরকেও না চরম মূল্য দিতে হয়!'

'শুদু পুরোনো ছবি দেকে এত ভয় পাচ্চেন? তাহালে আমার হাড়গিলে চেহারা দেকে না-জানি কি ভাবচেন আপনি!'

ওদের সামনে কৌতূহল ও সন্দেহ মেশানো গলায় রাজ মালহোত্রা রানাকে বলল, 'প্লেন ক্র্যাশ করল, তারপর নানান বিপদের মধ্যে দিয়ে এখানে এসে পৌঁছলেন...খুবই অবিশ্বাস্য একটা কাহিনী, নয়?'

শুনে পিছন থেকে শমি মন্তব্য করল, 'আমাদের সঙ্গে আপনার থাকা উচিত ছিল, তাহলে আর অবিশ্বাস করতে পারতেন না।'

রানাকে ব্যগ্র মনে হলো। 'খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করব মহামান্য প্রিন্স আজকের রাতটা যদি এখানে আমাদেরকে থাকতে দেন। কাল সকালেই আমরা নিজেদের পথে চলে যাব।' মনে মনে বলল: গোপনে প্রাসাদের প্রতিটি গোপন ও নিষিদ্ধ এলাকায় তল্লাশী চালাবার পর।

'আমি তো স্রেফ তাঁর অনুগত ভৃত্য–' বিনয়ের অবতার সেজে মাথা নত করল রাজ মালহোত্রা–'তবে মহামান্য প্রিন্স সাধারণত আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন।'

'এই কি সে?' সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুলটা শুধরে নিল শমি। 'মানে, তিনি?' দেয়ালে ঝোলানো শেষ প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। রীতিমত হতাশ

ও বিষণ্ণ দেখাল তাকে। শেষ ছবিতে একজন বৃদ্ধ মহারাজাকে দেখা যাচ্ছে, বয়স ষাটের কম হবে না।

'না-না!' তাড়াতাড়ি বলল রাজ মালহোত্রা। 'উনি হলেন নারায়ণাম চৌপল, বর্তমান মহারাজার স্বর্গীয় পিতৃদেব।'

শমির চেহারা আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বর্তমান মহারাজা নিশ্চয়ই তরুণ হবে। তার আন্দাজ, অবিবাহিতও হবে। সেই ছোটবেলা থেকে, যখন রূপকথা শুনত, প্রিন্সেস হবার খুব শখ তার। ছোটবেলার অনেক অবাস্তব স্বপ্নই বড় হবার পর হারিয়ে যায়। কিন্তু এই স্বপ্নটা কেন যেন অবচেতন মনে রয়ে গেছে। চৌপল প্রাসাদে আসার পর সেটা নতুন করে আশার আলো জ্বালছে তার মনে। হঠাৎ একটা প্রশ্ন জাগল। 'মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, ভারতে তো মহারাজাদের দিন অনেক আগেই গত হয়েছে, তাই না? এখানে একটা প্রাসাদ থাকা সম্ভব, কিন্তু সেই প্রাসাদে প্রিন্স বা রাজা-মহারাজা থাকেন কিভাবে?'

'কাগজে-কলমে অনেক কিছুই নেই, কিন্তু আনঅফিশিয়ালি আবার অনেক কিছুই আছে,' সহাস্যে জবাব দিল রাজ মালহোত্রা। 'চৌপল তো অতি প্রাচীন এলাকা। এখানে আদিবাসীরা বসবাস করে। আদিবাসীদের রাজা একসময় ছিল, এখন নেই। তাদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে বর্তমান মহামান্য প্রিন্সের পূর্ব-পুরুষরা এই এলাকা দখল করে নেন। প্রজারা আজও সেই আদিবাসী, শুধু তাদের রক্ষা ও শাসনকর্তা বদলেছে। ক্ষমতা বদলের পালা চলছে যুগ যুগ ধরে, তারই সঙ্গে আরও কত কি বদলে যাচ্ছে...'

পাশের একটা দরজা দিয়ে দু'জন পরিচারিকা বেরিয়ে এসে কুর্নিশ করল। রাজ মালহোত্রা শমিকে বলল, 'ওরা আপনাদেরকে পথ দেখিয়ে যার যার রুমে পৌঁছে দেবে। ওখানে আপনাদের জন্যে পরিষ্কার কাপড়চোপড় পাবেন। আজ রাতে মহামান্য প্রিন্সের সঙ্গে ডিনার খাবেন সবাই।'

'ডিনার?' শমির চোখ-মুখ থেকে আনন্দ আর উত্তেজনা উপচে পড়ছে। 'তাও একজন প্রিন্স-এর সঙ্গে? ভগবানের কৃপায় ভাগ্যদেবী মুখ তুলে আমার দিকে তাকাচ্ছে।' তারপরই একটা আয়নায় চোখ পড়তে কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল চেহারা। 'কিন্তু এই অবস্থায়? না! আমাকে তৈরি হতে হবে!' একজন প্রিন্সকে বড়শিতে গাঁথতে হলে টোপটা রীতিমত লোভনীয় হওয়া চাই। পরিচারিকাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে হন-হন করে নিজের কামরার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল সে।

রানার দিকে ফিরল রাজ মালহোত্রা। ঠাণ্ডা এক চিলতে হাসি উপহার দিয়ে বলল, 'প্লেযার প্যাভিলিয়নে রাত ঠিক আটটায়, মিস্টার রানা।'

পরস্পরের উদ্দেশে মাথা নোয়াল ওরা।

বিচিত্র প্রজাতির কয়েকশো বৃক্ষ ও ফুলশোভিত বাগানের মাঝখানে অসাধারণ একটা সোনালি গম্বুজ। রাতের শীতল বাতাসে গোলাপ, রজনীগন্ধা, বেলী আর জেসমিন ফুলের গন্ধ ভুরভুর করছে। সেতার, তানপুরা আর বাঁশীর শব্দে মশালের আলো যেন নৃত্য করছে গোটা বাগানে। চৌপল প্রাসাদের প্লেযার

প্যাভিলিয়নে আনন্দ আর আমোদের যেন বাণ ডেকেছে।

সরকারী পদস্থ কর্মকর্তা ও স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ীরা চৌপল মহারাজার সম্মানিত অতিথি হয়েছেন আজ, লতাপাতার তৈরি চাঁদোয়ার নিচে হাতে সোমরস নিয়ে অলস পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঠিক আটটার সময় গিল্টি মিয়াকে নিয়ে প্রাসাদের প্রমোদ প্রাঙ্গণে আবির্ভাব ঘটল মাসুদ রানার।

টুইডের জ্যাকেট আর বো-টাই পরেছে। ট্রাউজার ও শার্ট প্রাসাদের ক্রীতদাসরা ধুয়ে ইস্ত্রি করে দিয়েছে। তিন দিন বয়সী দাড়ি কাটেনি, অদ্ভুত প্রাইম মিনিস্টারের সামনে রাফ অ্যান্ড টাফ একটা চরিত্র হিসেবে দাঁড় করাতে চায় নিজেকে–আর, তাছাড়া, শমিকে এ-কথা ভাববার সুযোগ দিতে চায় না যে ও তাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করছে। গোসল-টোসল সেরে গিল্টি মিয়াও ঝকঝক করছে, তবে সে তার খাকি ঢোলা ট্রাউজার, আঁটসাঁট ম্যাগাজিন শার্ট আর সুতি ক্যাপটা বদলাতে রাজি হয়নি।

'সব মিলিয়ে জায়গাটা তোমার কেমন লাগছে, গিল্টি মিয়া?' নিচু গলায় জানতে চাইল রানা।

'ধুপ আর ধুনোর গোন্দো পাচ্চি। গাচের মগডালে বাদুড় ডানা ঝাপটাচ্চে। জেনারেটর আচে, তারপরও মশালের আলোই বেশি দেকা যাচ্চে। জায়গাটা ভাল নয়, সার।'

হাত তুলে আইভরির তৈরি একটা সানডায়াল দেখাল রানা। 'ওটা প্রাচীন তামিলদের হাতের কাজ। কোনও মিউজিয়াম থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে।'

এই সময় রাজ মালহোত্রাকে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় আধা-সামরিক বাহিনী বি.এস.এফ-এর একজন ইউনিফর্ম পরা অফিসার। প্রাইম মিনিস্টার পরিচয় করিয়ে দিল। 'আজ আমাদের ভাগ্য এতই ভাল যে অপ্রত্যাশিত অতিথির কোন অভাব নেই। ইনি মেজর অশোক মেহতা।'

রানা ও গিল্টি মিয়ার সঙ্গে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে করমর্দন করলেন মেজর অশোক মেহতা। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের বেশি হবে তো কম নয়। ইউনিফর্মে বেশ ক'টা মেডেল দেখা যাচ্ছে। 'হ্যালো,' তাঁকে বলল রানা। 'সূর্য ডোবার আগে দেখলাম আপনার ট্রুপস প্রাসাদে ঢুকছে।'

'স্রেফ একটা রুটিন ইন্সপেকশন ট্যুর, তার বেশি কিছু নয়,' উপস্থিত সবাইকে আশ্বস্ত করলেন মেজর অশোক মেহতা।

ওরা চারজন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে প্রাসাদের আর্কিটেকচার দেখছে, অন্য একটা পথ দিয়ে বাগানে ঢুকল শমি। তার চেহারাটাও মুগ্ধ না করে পারল না রানাকে।

শমি এই মুহূর্তে একটা নীল পরী। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে যথেষ্ট ঘষেমেজে মহামান্য প্রিন্সের জন্যে নিজেকে তৈরি করেছে সে। গাঢ় নীল সিল্ক একটা শাড়ি পরেছে, V আকৃতির নেকলাইন ব্রোকেড দিয়ে মোড়া। তার রাশি রাশি চুলে আটকে রয়েছে ডায়মন্ড-অ্যান্ড-পার্ল টায়রা, কানে সোনার ঝুমকো, নাকে হীরে বসানো নথ, গলায় রত্নখচিত সাতনরী হার–বুকের কাছে নেমে এসে চমকাচ্ছে। শাড়ি ছাড়াও, অতি সূক্ষ্ম এক প্রস্থ সিল্ক রয়েছে তার মাথা ও কাঁধ

ঢাকার জন্যে। এ সত্যিই এক অবিশ্বাস্য রূপান্তর।

'তোমাকে সত্যিকার প্রিন্সেস মনে হচ্ছে,' বলল রানা।

যতদূর মনে পড়ে, তাকে বলা এটাই ভাল কোন কথা রানার; শোনার পর মুখ গরম ও রাঙা হয়ে উঠতে চাইল। রাজ মালহোত্রা ও অশোক মেহতাও তার প্রশংসা করলেন। এরপর প্রাইম মিনিস্টার জানাল যে ডিনার পর্ব শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই, পথ দেখিয়ে ওদেরকে ডাইনিং হলে নিয়ে এলো সে। শমি কানে ফিসফিস করল রানা, 'প্রিন্সের জন্যে বেশি ব্যাকুলতা দেখিয়ো না; তোমার মনে হচ্ছে তুমি মুখ খুললেই লালা ঝরবে।'

'এ যেন হঠাৎ আমি একটা স্বর্গে এসে পড়েছি,' স্বীকার করল শমি। 'চিন্তা করো, এই যুগে সত্যিকার একজন প্রিন্স! তুমি বুঝবে না, খুবই সম্ভাবনা আছে আমার ছোটবেলার একটা ফ্যান্টাসী এখানে বাস্তবে পরিণত হবার।'

ডাইনিং হলে প্রকাণ্ড গ্র্যানিট পাথরের সারি সারি পিলার, গায়ে নির্যাতিত পেত্নী আর অশরীরী আত্মার প্রতীক হিসেবে খোদাই করা হয়েছে বল্লমবিদ্ধ নগ্ন নারীমূর্তি আর জ্বলন্ত নরকংকাল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা ট্র্যান্সপারেন্ট বা স্বচ্ছ ছায়ামূর্তি। পিলারের মাথায় সিলিঙেও এরকম অসংখ্য বীভৎস দৃশ্য। এ-সব দেখার পর কারও আর খিদে থাকে! বিশজনের বসবার মত লম্বা একটা টেবিলে প্লেট, পিরিচ, ডিশ, গ্লাস, চামচ ইত্যাদি সবই নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি। সারা শরীরে ভারী স্বর্ণালংকার পরে প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে দরজায়।

একপাশে নাচ চলছে। বাজনদাররা প্রায় সবাই বুড়ো। নাচিয়ে মেয়েগুলোকে স্থানীয় বলে মনে হলো না, এরা সম্ভবত রাজপুতানার মেয়ে, ভাড়া করে আনা হয়েছে।

পাশ দিয়ে রাজ মালহোত্রা যাচ্ছে দেখে খপ করে তার একটা হাত ধরে শমি জানতে চাইল, 'এক্সকিউজ মি, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, মহারাজার ওয়াইফের নামটা যেন কি? মানে, আমরা তাঁকে কি বলে সম্বোধন করব?'

'হিজ হাইনেস এখনও বিয়ে করেননি।' যে কোন কারণেই হোক বিব্রত দেখাচ্ছে রাজ মালহোত্রাকে।

শমির চেহারায় যেন আলো জ্বলে উঠল। 'এর মানে উপযুক্ত মেয়ের দেখা পাননি তিনি।'

হঠাৎ ড্রাম বেজে উঠল। অতিথিদের টেবিলে বসার আহ্বান। বসতে হবে গদিতে, প্রয়োজনে বালিশে হেলান দিয়ে, কারণ টেবিলটা খুবই নিচু, এবং ওটার সঙ্গে কোন চেয়ার নেই। সবাই বসার পর দেখা গেল টেবিলের শুধু মাথার দিকটা খালি। খালি গদি বা আসনের ডান দিকে বসেছে রানা, মেজর অশোক মেহতার পাশে। ওদের উল্টো দিকে শমি আর গিল্টি মিয়া, সম্মানসূচক আসনের বাম দিকে।

রাজ মালহোত্রা এক কোণে সরে গেল, শমির কাছাকাছি, তালি দিল দু'বার, তারপর একটা ঘোষণা দিল—প্রথমে হিন্দিতে, পরে ইংরেজিতে: 'অরুণাচল-আসাম সীমান্তের রক্ষক ও অধিপতি, চৌপল-এর মহারাজা, মহামান্য পবনম বৈশাখম চৌপল!'

সবার দৃষ্টি আছড়ে পড়ল প্রাইম মিনিস্টারের পিছনে, নিরেট রুপোর তৈরি একটা দরজার ওপর। কবাট দুটো ধীরে ধীরে খুলে গেল। চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন মহারাজা পবনম বৈশাখম চৌপল। ডাইনিং হলের সবাই বাউ করল।

রানা দেখল শমির চোয়াল আক্ষরিক অর্থেই খুলে গেছে। একবার তার দিকে, একবার ডাইনিং হলে প্রবেশরত মহারাজার দিকে তাকাচ্ছে ও। পবনম বৈশাখম চৌপল মাত্র তেরো বছরের বালক।

'এই ছোঁড়া প্রিন্স? চৌপলের মহারাজা?' শমি ফিসফিস করল। 'পুঁচকে একটা ছোঁড়া?' মানুষের কোন মুখ হতাশার এত ভার এর আগে বোধহয় কখনও বহন করেনি।

'মহারাজা সম্ভবত আরও অনেক বয়স্কা মহিলা পছন্দ করেন,' রানার নির্দোষ মন্তব্য।

হেঁটে এসে টেবিলের মাথায় সোনালি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসল খুদে মহারাজা। সোনা ও রুপোর কাজ করা ঢোলা আলখেল্লা পরেছে সে, তাতে লেগে আছে ডায়মন্ড, রুবি, এমারেল্ড ও মুক্তো। পাগড়িটাও মূল্যবান রত্নখচিত।

রানার ঠোঁটে সহানুভূতিসূচক হাসি, কারণ শমির সম্রাজ্ঞী হবার স্বপ্ন কর্পূরের মত উবে গেছে। 'আরে ভুলে যাও!' সান্ত্বনা দিয়ে বলল ও। 'প্রিন্সকে হারিয়েছ, কিন্তু ডিনার তো আসছে।'

ঠিক এই কথাটাই শোনার দরকার ছিল শমির। তার হতবিহ্বল চেহারায় খানিকটা পরিবর্তন দেখা দিল; যেন মুখের ভেতর পানি জমেছে। 'এরকম খিদে জীবনে কখনও পায়নি আমার।'

রুপোর বড় বড় ডিশ নিয়ে হাজির হলো চাকরবাকররা, সদ্য রান্না করা খাবার থেকে ভাপ উঠছে। চোখ বুজে মশলার গন্ধ নিল শমি। চোখ খোলার পর দেখল ফার্স্ট কোর্স এরইমধ্যে তার সামনে পরিবেশন করা হয়েছে-রোস্ট করা গোটা একটা শুয়োর, পিঠে ও পেটে এখনও তীর গাঁথা। বিমূঢ় শমি বিড়বিড় করল, 'এ জিনিস কে খায়!'

রানাকেও সতর্ক ও সন্দিহান দেখাচ্ছে। মেজর অশোক মেহতার দিকে তাকাল ও। তিনিও বিস্মিত ও বিড়ম্বিত। শমি ডিশ-এর দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতে পর্যন্ত পারছে না। তাকে রানা বলল, 'দ্বিতীয় কোর্সের জন্যে অপেক্ষা করো।'

নাবালক মহারাজা একটু ঝুঁকে রাজ মালহোত্রার কানে কানে কিছু বলল। প্রাইম মিনিস্টার মাথা ঝাঁকিয়ে উপস্থিত অতিথিদের উদ্দেশে বাণীটা প্রচার করল, 'মহামান্য মহারাজা দেশী বিদেশী সব ক'জন অতিথিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে আসা মিস্টার মাসুদ রানাকে উষ্ণ ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তিনি।'

ছোট্ট বালকের উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'এখানে উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। মহারাজার কোন উপকারে লাগতে পারলে নিজেদেরকে আমরা ধন্য মনে করব।'

কথাটা শুনে বালক মহারাজার চোখেমুখে কালো একটা ছায়া পড়ল। ঠিক

উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল প্রাইম মিনিস্টারের—তার চোখ দুটো যেন মুহূর্তের জন্যে আগুনের মত জ্বলে উঠল।

রানাও ঠিক এই সময়টাকেই বেছে নিল। 'আমার কিছু প্রশ্ন আছে, প্রাইম মিনিস্টার। মহারাজার কিছু আর্টিফ্যাক্ট পরীক্ষা করছিলাম...'

'প্রাচীন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন...'

'সবগুলো প্রাচীন বলে মনে হয়নি আমার,' বলল রানা। 'কিছু ঠগীর মূর্তি দেখলাম। কিছু ছবিতে দেখলাম কাপালি জাতির নৃশংসতার শিকার নিরীহ কুমারী মেয়েদের।' আঙুল তুলে সিলিং-এর দিকটা ইঙ্গিত করল ও। 'ওপরেও কাপালি ও ঠগীদের প্রশংসাসূচক চিত্র আঁকা রয়েছে। এ-সবের মানে যদি একটু ব্যাখ্যা করেন, প্লীজ।'

সঙ্গে সঙ্গে ডাইনিং হলের পরিবেশ বদলে গেল। এখন যদি মেঝেতে একটা পিন পড়ে, সেটাও বিস্ফোরিত বোমার মত শোনাতে পারে।

রাজ মালহোত্রা ভব্যতা বজায় রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। 'আপনার বুঝতে ভুল হয়েছে, মিস্টার রানা। ঠগীরা মা কালীর পূজা করত, মা কালীর উদ্দেশে মানুষ বলি দিত। চৌপল প্রাসাদের কোথাও আপনি মা কালীর মূর্তি বা চিত্র খুঁজে পাবেন না। ঠগী বা কাপালিদের মূর্তি বা চিত্র অবশ্যই আছে, তবে সে-সব প্রশংসা বা নিন্দার্থে নয়। সৌখিন ও শিল্পবোধসম্পন্ন একজন মহারাজার কালেকশন ওগুলো, তার বেশি কিছু নয়।'

'কালী নেই, তার বদলে দশ মাথা ও দশ হাতঅলা পুরুষমূর্তি আছে,' বলল রানা। 'দেখে মনে হয় শয়তানের প্রতিনিধি। তার সামনে বলি দেয়ার দৃশ্যও যেন চোখে পড়ল।' রানা হাসিমুখে আলাপ করছে।

আলোচনায় এবার মেজর অশোক মেহতাও যোগ দিল। 'ওহ্, ঠগী? ডেঞ্জারাস ব্রুটস। পথিকদের গলায় রশি পেঁচিয়ে খুন ও ডাকাতিই তাদের পেশা। প্রসঙ্গটা যখন উঠলই, না বলে পারছি না যে ঠগীরা কিন্তু আজও আছে। শোনা যায়, এই এলাকাতেই তাদের আস্তানা। ট্রুপস নিয়ে এদিকে আমার ইন্সপেকশনে আসার সেটাই কারণ।'

'এটা আমাদের কাছে নতুন খবর,' রাজ মালহোত্রা সহাস্যে বলল। 'ইতিহাস বলে, অন্তত দুশো বছর আগে ঠগীরা ভারতের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

দ্বিতীয় কোর্স এলো রুপোর গামলায়। এটা থেকেও ভাপ আর মশলার সুগন্ধ বেরুচ্ছে, তবে পুদিনার ঝাঁঝটাই যেন একটু বেশি। প্রচণ্ড খিদে আর অনেক প্রত্যাশা নিয়ে নিজের গামলার ওপর ঝুঁকে পড়ল শমি। প্রথমে মনে হলো ঘোলা পানিতে সাঁতার কাটছে আফ্রিকান মাগুর। তারপর শমির ভুল ভাঙল। ওগুলো আফ্রিকান মাগুর নয়, ঈল বা বাইন মাছ—রান্না করা হয়েছে গায়ের পিচ্ছিল ত্বক বা ছাল না তুলেই। মাছগুলোকে জ্যান্ত মনে হবার কারণ, কিনারায় উঠে আসা ঝোল এত গরম যে এখনও একটু একটু ফুটছে বা উথলাচ্ছে।

এরপর এলো ব্যাঙের সুপ, সাপের দোপেঁয়াজা, বানরের ভাজা মগজ ও তেলাপোকার চাটনি।

শমির এখন একটাই সমস্যা। খিদে বলতে কিছুই তার নেই। বরং সাংঘাতিক বমি পাচ্ছে।

রানা, গিল্টি মিয়া ও মেজর অশোক মেহতা কেউ কিছু মুখে দিচ্ছে না; সবাই ভাব দেখাচ্ছে তারা গল্পে মশগুল। রাজ মালহোত্রা মেজরকে আশ্বস্ত করার সুরে বলছে, 'ইন্সপেকশন করুন না, করুন! কিন্তু শুধু এ তল্লাটে কেন, ভারতের কোথাও আপনি একজন ঠগীও খুঁজে পাবেন না। আসলে কি জানেন, ঠগীদের শক্তির উৎস ছিলেন মা কালী। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, ঠগীদের ওপর মা কালী অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এই অসন্তুষ্টির কারণে ঠগীরা মানুষ বলি দিলেও ডাকাতি করার সাহস ও শক্তি পেত না। পরে ধরা পড়তে শুরু করে তারা। এভাবে ঠগীরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।'

'কিন্তু আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে নতুন আরেক দল ঠগী গজিয়েছে চৌপল এলাকায়। তাদের মধ্যে কাপালিরাও আছে। মা কালীর প্রতি তাদের আস্থা নেই। তাদের ক্ষমতার উৎস খোদ পিশাচ বা শয়তান। কালীর বদলে শয়তানের মূর্তি তৈরি করছে তারা।'

'এসব আসলে,' হেসে উঠে বলল রাজ মালহোত্রা, 'ভিত্তিহীন লোককাহিনী আর মিথ্যা প্রচার।'

'কিন্তু প্রাসাদে আসার পথে,' বলল রানা, 'এরকম ভয়ালদর্শন একটা মূর্তি কিন্তু আমি দেখেছি। প্রায় হুবহু কালী মূর্তিই, তবে এটা পুরুষ—হতে পারে একটা শয়তানের মূর্তিই।'

মহারাজ চৌপল ও প্রাইম মিনিস্টার দৃষ্টি বিনিময় করল। জবাব দেয়ার আগে নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় লাগল রাজ মালহোত্রার। গম্ভীর মুখে বলল, 'ও, হ্যাঁ। ছোটবেলায় ওখানে আমরা খেলতাম। বাবা সব সময় আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলতেন—খবরদার, দশ মাথাঅলা শয়তান যেন তোমার আত্মা চুরি করতে না পারে। তবে কোন অমঙ্গল বা বিপদের কথা আমার মনে পড়ে না। এ-সব আসলে গ্রাম্য রটনা, মিস্টার রানা। তবে গুজবগুলো প্রাসাদ পর্যন্ত নিয়ে এসে মেজর অশোক মেহতাকে আপনি উদ্বিগ্ন করে তুলেছেন।'

'উদ্বিগ্ন নই,' বললেন মেজর, 'মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার। তবে ইন্টারেস্টেড।'

ওদিকে গিল্টি মিয়ার সময় কিন্তু মন্দ কাটছে না। পোষা একটা ছোট্ট বাঁদরের চোখে সে খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। উল্টোটাও যথেষ্ট সত্যি। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, টেবিলের অনেকেই কিছু মুখে দিতে না পারলেও, গিল্টি মিয়া রীতিমত গ্রোগ্রাসে গিলছে। তাকে ওই খাবার যোগান দিচ্ছে সদ্য পরিচিত বন্ধু বানরটি। হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সে, গিল্টি মিয়ার কাঁধে ফিরে আসছে একটু পরই। প্রতিবার তার হাতে কলাটা, পেঁপেটা, আপেলটা···কিছু না কিছু থাকছেই। প্রতিটি ফল দু'জন ভাগাভাগি করে খাচ্ছে। পোষা বাঁদরের এই বদান্যতা দেখে গিল্টি মিয়া নিচু গলায় একবার তো বলেই ফেলল, 'সমাজে তো সত্যি কতার দাম নেই, তাই তোকেই শুধু জানাচ্ছি—তোর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট আত্মীয়তার বন্ধন আমি অস্বীকার করি না।' ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল। 'তবে

চুপ! কেউ শুনে ফেললে আমার পেসটিজ পাংচার হয়ে যাবে।'

টেবিলের মাথার দিকে অস্বস্তিকর আলোচনাটা রানা থামতে দিচ্ছে না। 'আপনি জানেন,' বলল ও, 'ওদিকের গ্রামবাসীরা আরও বলছে যে চৌপল প্রসাদ তাদের একটা অতি মূল্যবান জিনিস কেড়ে নিয়ে এসেছে।'

'মিস্টার রানা,' প্রাইম মিনিস্টার রাজ মালহোত্রার কণ্ঠস্বর গুর-গুর মেঘ ডাকার মত ভারী শোনাল, 'আমাদের দেশে একজন মেহমান, সাধারণত তার মেজবানকে এ ধরনের কথা বলে অপমান করেন না।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'আমার ধারণা ছিল আমরা স্রেফ গ্রাম্য গুজব বা লোককাহিনী নিয়ে রসালাপ করছিলাম।'

'কি জিনিস সেটা?' জানতে চাইলেন মেজর মেহতা। 'কেড়ে নিয়ে এসে হয়েছে?'

'পবিত্র একটা পাথর...'

'হাহ্!' প্রায় ঘেউ করে উঠল রাজ মালহোত্রা। 'দেখলেন তো, মেজর, একটা পাথর!'

সবাই অস্বস্তি নিয়ে হেসে উঠল।

কিন্তু রানা সহজে দমবার পাত্র নয়। 'ওটা সাধারণ কোন পাথর ছিল না, প্রাইম মিনিস্টার। ওটা ছিল শিবলিঙ্গ। তাছাড়া, গ্রামবাসীদের অভিযোগ এখানেই শেষ নয়।'

'ওরা কিন্তু মহারাজার প্রজা, মিস্টার রানা—আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন। তাদের কোন অভিযোগ থাকলে তারা সরাসরি প্রাসাদে এসে বলতে পারে। একজন বিদেশী ট্যুরিস্টকে পাঠাবার কি দরকার?'

এই সময়, এই প্রথম মুখ খুলল বালক মহারাজা। 'কাপালি জাতি আর ঠগীদের বসবাস এই এলাকায় সত্যি একসময় ছিল। কিন্তু এখন? আছে, এ-কথা আমি বলতে পারব না। আবার নেই বলাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

গোটা টেবিল জুড়ে গুঞ্জন উঠল। অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজা কোন বিষয়ে মতামত দেবে, এটা যেমন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত, তেমনি অনভিপ্রেতও বটে। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে, সবাই তারা অসন্তুষ্ট ও উদ্বিগ্ন। 'মহারাজ—'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রাজ মালহোত্রা, তাকে থামিয়ে দিয়ে চৌপল-এর মহারাজা পবনম বৈশাখম বলল, 'কাপালি আর ঠগীরা নেই, এ-কথা কেন আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়? এই জন্যে সম্ভব নয় যে ইদানীং প্রায়ই আমি তাদেরকে স্বপ্নে দেখছি।' একটু বিরতি নিল সে। 'তবে স্বপ্ন যদি শুধু স্বপ্নই হয়, তাহলে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোন মানে হয় না। মিস্টার রানা, গ্রামবাসীদের বলবেন, সব কাজ তো আর আমাকে জানিয়ে করা হয় না, তাই যদি কোন অন্যায় কারও সঙ্গে করা হয়ে থাকে, আমি অবশ্যই তার প্রতিকার করব।' কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

'আমি যদি মহারাজার মনে ব্যথা দিয়ে থাকি, সেজন্যে সত্যি দুঃখিত,' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভেঙে শান্ত সুরে বলল রানা।

'আপনি এটাকে অরুচিকর মেন্যু বলবেন না?' প্যাভিলিয়ন থেকে বেরিয়ে বাগানে পায়চারি করার সময় রানাকে প্রশ্ন করলেন মেজর মেহতা। ওদের সঙ্গে গিল্টি মিয়াও রয়েছে। খানিক আগে নিজের কামরার উদ্দেশে হন হন করে হেঁটে যেতে দেখেছে ওরা শমিকে, ন্যাপকিনে চোখ মুছতে মুছতে।

বাগানে কয়েকশো মশাল জ্বলছে। ফুলের সুবাসের সঙ্গে বাতাসে মিশে আছে হুঁকো থেকে বেরুনো তামাকের গন্ধ।

'ওরা কি আমাদেরকে তাড়াবার জন্যে এই কাণ্ডটা করল?' মেজরকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'সব কিছু দেখে মনে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এরা আসলে কেমন মানুষ?'

মেজর মাথা নেড়ে বললেন। 'আপনার এই ধারণা বোধহয় ঠিক না। ভারতীয়রা অতিথিপরায়ণ জাতি, তারা কোন অতিথিকে তাড়াতে চাইবে না।'

রানা একমত হতে না পারলেও মুখে বলল, 'হয়তো নয়।'

'এবার আমাকে বিদায় নিতে হয়, মিস্টার রানা। সৈনিকদের ছুটি দিতে হবে, রিপোর্ট শুনতে হবে। আবার হয়তো দেখা হবে...'

'আশা করি। ধন্যবাদ, মেজর।'

গিল্টি মিয়াকে নিয়ে কিচেনে চলে এলো রানা। ওর ধারণা, একটা প্রাসাদ সম্পর্কে ভাল ধারণা পেতে হলে কথা বলতে হবে চাকরবাকরদের সঙ্গে। কিন্তু কিচেনে বিশ-বাইশজন লোক নিজেদের কাজে এত ব্যস্ত আর বাইরের কোন লোকের সঙ্গে কথা বলতে এতটাই অনাগ্রহী যে কেউ তারা ওদের দিকে সরাসরি তাকাল না পর্যন্ত। রানার প্রতিটি প্রশ্ন শুনতে না পাওয়ার ভান করল তারা। রানা শুনে ফেলবে, এই ভয়ে চাপা গলায় গিল্টি মিয়া মন্তব্য করল, 'ইচ্চে করচে শালাদের পোঁদে কষে একটা করে লাত্ মারি!'

'কিছু বললে, গিল্টি মিয়া?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এটা ধরতে বলচি,' বলে রানার হাতে চীনামাটির বড় একটা গামলা ধরিয়ে দিল গিল্টি মিয়া। গামলাটা রূপোর ঢাকনি দিয়ে ঢাকা। 'এর ভেতর কি আচে ঘরে গিয়ে দেকবেন। দেকলেই বুজতে পারবেন, এগুলো নিয়ে কি করতে হবে।'

কিচেন থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, গামলার ব্যাপারে কারও যেন কোন মাথাব্যথা নেই।

শমির দরজায় নক করতে যাবে রানা, তার আগেই কবাট দুটো খুলে গেল। তার বেশভূষা আগের মতই, রাজরানী সেজে আছে। 'ওমা, কি ভয়ানক একটা সারপ্রাইজ!'

'তোমার জন্যে এটা আনলাম,' ইঙ্গিতে হাতের গামলাটা দেখিয়ে বলল রানা।

'তোমার কাছে এমন কিছু নেই যা আমি চাইতে পারি,' বলল শমি, তবে মনে মনে স্বীকার করল—আসলে তোমার কাছে এমন কিছু নেই যা আমি অগ্রাহ্য করতে পারি। কিন্তু আমার কাছে আমার একটা মর্যাদা আছে, সেই মর্যাদা দাবি

করে তুমি আমার গুণকীর্তন করছ, আমার বন্দনায় মুখর হয়ে উঠছ।

'ঠিক আছে।' মাথা ঝাঁকাল রানা। যেখানে তুমি অবাঞ্ছিত সেখানে থাকা ঠিক নয়। ঘুরল ও, গামলার ভেতর থেকে বের করে কচ্-কচ্ শব্দ করে কামড় বসাল একটা আপেলে।

শব্দটা শুনল শমি। চোখের পলকে রানার সামনে চলে এসে আপেলটা কেড়ে নিল। মস্ত এক কামড় দিল, চোখ বুজে চিবাচ্ছে। আপেল তার কোনদিনই ভাল লাগে না, কিন্তু আজ স্বাদটা যেন অমৃতকেও হার মানাবে। চোখ মেলল। রুপোর ঢাকনিটা তুলে গামলার ভেতর তাকাল। কলা, পেঁপে, আম, আঙুর–ভারতে পাওয়া যায় এমন কোন্ ফলটা নেই এখানে? গামলার ওপর হামলে পড়ল ও। মৃদু হেসে ফিরে এলো রানা নিজের ঘরে।

গোটা তিনেক অমৃতসাগর কলা আর চারটে ফজলি আম সেঁটে দিয়ে বিছানার ধারে চলে এলো রানা। খানিক বিশ্রাম নিয়ে তারপর বেরোবে প্রাসাদের কোথায় কি আছে দেখতে।

খাটে উঠতে যাবে, এমনি সময়ে কামরার শেষ প্রান্তে ওয়াল পেইন্টিংটা একটু নড়ল। ওটার পিছন থেকে কালো কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা একজন গার্ড নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে এসে রানার গলায় সরু একটা নাইলন কর্ড পরিয়ে দিল। চট করে গ্যারটের ভেতর কয়েকটা আঙুল ঢোকাতে পারলেও রানা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অনুভব করল ওর কণ্ঠনালী প্রায় দুভাগ করে দেয়ার উপক্রম করেছে কর্ডটা। ফুসফুসে বাতাস টানতে ব্যর্থ হয়ে ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলো ও। চোখ দুটো ফুলছে, ক্রমশ লাল হচ্ছে। অকস্মাৎ, বিদ্যুৎগতিতে এক ঝাঁকিতে মেঝের দিকে ঝুঁকল রানা–ওর পিঠের ওপর দিয়ে উড়ে এসে সামনে পড়ল গার্ড।

মেঝেতে পড়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা, কোমরের খাপ থেকে ভোজালিটা বের করল। সেদিকে চোখ রেখে তার মাথায় কাঁচের একটা জগ ভাঙল রানা–ভোজালিটা মেঝের ওপর দিয়ে ধাতব আওয়াজ তুলে গড়িয়ে গেল। এই সময়ে পাশের ঘরে একটা শব্দ হতে দরজার দিকে মুখ তুলল রানা। সুযোগ পেয়ে ওকে লক্ষ্য করে লাফ দিল গার্ড, হাতে বেরিয়ে এসেছে চাবুক। গার্ডকে নিয়ে পাশের কামরার দরজায় আছাড় খেলো রানা। পরমুহূর্তে কনুই চালাল ওর কিডনি বরাবর। হাতের চাবুক ছেড়ে দিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ল গার্ড মেঝেতে।

আওয়াজে আগেই ঘুম ভেঙে গেছে গিল্টি মিয়ার। দু'কামরার মাঝখানের দরজা খুলে দেখল কালো কাপড় পরা একজন গার্ড মেঝে থেকে ভোজালি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। চাবুকটা তুলে নিয়েই সপাং করে মারল গিল্টি মিয়া, সোজা গিয়ে ওটার নরম আগাটা ঠগী গার্ডের গলায় জড়িয়ে গেল। চাবুক ধরে হ্যাঁচকা টান দিল গার্ড, গিল্টি মিয়ার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল হাতলটা, সোজা উঠে গেল ঘুরন্ত সিলিং ফ্যানে।

একটা স্পিনিং রীল-এ ফিশিং লাইন যেভাবে প্যাঁচায়, ফ্যানের ঘুরন্ত ব্লেডে আটকে চাবুকটাও ঠিক সেইভাবে জড়াচ্ছে। গলায় প্যাঁচানো চাবুকের টানে লোকটা ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে সিলিঙের দিকে। মার্বেল পাথরের মেঝে ছেড়ে

শূন্যে উঠে গেছে পা দুটো। চোখের সামনে ঠগীর আধুনিক সংস্করণ-এর ফাঁসি হয়ে যাচ্ছে।

'গিল্টি মিয়া, ফ্যান বন্ধ করো!' বলল রানা। 'আমি আসছি এখুনি।'

দরজা খোলাই ছিল, বিস্ফোরিত কবাটের ভেতর দিয়ে ঝড়ের মত ভেতরে ঢুকল রানা।

শমি খাটের ওপর নরম বিছানায় শুয়ে আছে, হৃৎপিণ্ড চঞ্চল প্রজাপতি বললেই হয়। 'ওহ্, রানা! এলে তাহলে!'

রানা ডাইভ দিয়ে বিছানায় পড়ল।

হামাগুড়ি দিয়ে বিছানাটা পার হলো ও, ঝুঁকে খাটের নিচটা দেখল। খালি। মেঝেতে নামল ও, হন্যে হয়ে কামরার চারদিকে তল্লাশী চালাচ্ছে।

'আমি এখানে!' ডাকল শমি।

রানা ওর কাজ করে যাচ্ছে। বিছানার পর্দা সরাল শমি। বিছানার শেষ প্রান্তে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল রানা। 'এখানে কেউ তো নেই,' বিড়বিড় করল।

'না, শুধু একা আমি,' ফিসফিস করল শমি, শেষ পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিল।

একটা আয়নার দিকে এগোল রানা। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে ওর পিছু নিল শমি। ফুলদানীর পাশ থেকে কিছু একটা ভেসে আসছে—ঠাণ্ডা বাতাস? আততায়ী ওর কামরায় ঢুকেছিল চোরাপথ দিয়ে, এই ঘরেও সেরকম গোপন পথ থাকতে পারে। একটা পিলারের দিকে হেঁটে এলো রানা। বাতাসটা এখানে একটু যেন বেশি।

শমি ওর পিছু পিছু ঘুরছে। 'রানা, দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার আচরণ অত্যন্ত রহস্যময় লাগছে আমার কাছে।'

পিলারটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে রানা। পাথর খোদাই করে নৃত্যরত নগ্ন এক তরুণীর ভাস্কর্য। জুতো, হাঁটু, উরু, তলপেট আর বুকে হাত বুলাচ্ছে রানা।

শমির দৃষ্টিতে ব্যাপারটা স্বাভাবিক লাগছে না। 'এই বোকা, আমি তো এখানে!'

লিভারটা স্তনে। অকস্মাৎ ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে গোটা পিলার দেয়ালের ভেতর সেঁধিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, তৈরি হলো টানেলে ঢোকার একটা প্রবেশপথ।

ভেতরে পা রাখল রানা। দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বেলে দেয়ালের লিখনটা পড়ল: 'ধাপ বেয়ে মহামান্য শয়তানের পথ ধরো।'

'এর মানে কি?' ফিসফিস করল শমি, উত্তেজনায় গলাটা কেঁপে গেল। এই মুহূর্তে রানার ঠিক পিছনে সে।

'শিব-এর কাছ থেকে পাওয়া পাঁচটা পাথরের অলৌকিক ক্ষমতা আছে...' থেমে পকেট থেকে প্রাচীন কাপড়ের টুকরোটা বের করে সংস্কৃত লেখার সঙ্গে দেয়াল লিখন মেলাল রানা।

ইতোমধ্যে শমির ঘরে ঢুকে পড়েছে গিল্টি মিয়া, টানেলের দিকে এগিয়ে

আসছে সে। ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'গিল্টি মিয়া, [illegible] নিয়ে এসো।'

কামরা ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল গিল্টি মিয়া। রানা ঢুকে পড়ল টানেলের ভেতর।

আট

'নিচে কি?' ফিসফিস করল শমি।

'সেটাই দেখতে যাচ্ছি। তুমি এখানে অপেক্ষা করো। এক ঘণ্টার মধ্যে না ফিরলে মেজর মেহতার ঘুম ভাঙিয়ে আমাদের খোঁজ নিতে বলবে।'

মাথা ঝাঁকাল শমি। রানার ব্যাগ নিয়ে ফিরে এলো গিল্টি মিয়া। গোপন প্যাসেজ ধরে নামতে শুরু করল ওরা। প্রথম বাঁকের কাছে সামনে থাকল গিল্টি মিয়া, নিশ্চিত হতে চায় 'সার'-এর জন্যে জায়গাটা নিরাপদ কিনা। তবে ছায়াগুলো অদ্ভুতুড়ে লাগছে তার। 'সার, আমি ঠিক বুজতে পারচি না এখানে আমাদের কি কাজ!'

কলার ধরে গিল্টি মিয়াকে শূন্যে তুলল রানা, নিজের পিছনে নামাল। 'তুমি সামনে থাকবে না, গিল্টি মিয়া। পা ফেলবে আমি যেখানে পা ফেলি। আর ভুলেও কিছু ছোঁবে না।'

গিল্টি মিয়া মাথা ঝাঁকাল ঠিকই, কিন্তু কিছুদূর যাবার পর টানেলের গায়ে একটা দরজা দেখে ভাবল, সার যখন ওটা দেখতে পায়নি একটু টান দিয়ে দেখি তো খোলে কিনা। খুলল কবাট, সেই সঙ্গে একজোড়া কংকাল আছড়ে পড়ল তার গায়ে।

চিৎকার দিয়ে ধপাস করে টানেলের মেঝেতে বসে পড়ল গিল্টি মিয়া। 'সার, কেউ যেন কিছু শেকাতে চাইচে আমাদের!'

তাকে ধরে দাঁড় করাল রানা। পরবর্তী বাঁক পর্যন্ত প্রায় বয়ে নিয়ে এলো। এদিকে বাতাসের গতি আরও বাড়ল। ছাড়ানো চামড়া বা ছাল এসে ওদের চোখে-মুখে লাগছে—দেখে মনে হলো মানুষের ছাল।

নিজের ছুরিটা বের করল গিল্টি মিয়া। 'প্রয়োজনে আমরাও ছাল ছাড়াতে জানি!'

আরও ছাল বাড়ি মারল ওদের মুখে। 'ভয় পেয়ো না, গিল্টি মিয়া,' অভয় দিয়ে বলল রানা। 'ওরা স্রেফ ভয় দেখাতে চাইছে আমাদের।'

ধীরে ধীরে হাঁটছে ওরা। টানেলটা পাথরের তৈরি—ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে, নিরেট ও ঢালু। যত নিচে নামছে ততই গাঢ় হচ্ছে অন্ধকার। 'গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকো!' গিল্টি মিয়াকে বলল রানা। 'তা না হলে হারিয়ে যাবার ভয় আছে।'

আরও কয়েক ফুট এগোবার পর পায়ের তলায় মুচমুচে কিছু পড়ল, 'কিসে যেন পা দিয়ে ফেলেচি,' ভয়ে ভয়ে বলল সে।

'হ্যাঁ, মেঝেতে মচমচে বিস্কিট বা···কিছু আছে,' বলল রানা। না, বিস্কিট নয়। যাই হোক, জিনিসগুলো সচল। দেশলাই জ্বালল ও। চারদিকে তাকাল দু'জন। ওদের সামনে একটা দেয়াল, গায়ে দুটো গর্ত। একটা গর্ত থেকে দুনিয়ায় যত রকমের পোকা আছে, সব তীব্র স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে–তেলাপোকা, টিকটিকি, মাকড়সা, বিছা, কেন্নো, গিরগিটি, গান্ধিপোকা, কাঠপিঁপড়ে, গুবরে পোকা, কেঁচো ইত্যাদি।

'ই-ই-ই-স্! ঘেন্না করচে, সার!' লাফ দিয়ে উঠল গিল্টি মিয়া।

হাত ঝাপটা দিয়ে গা থেকে পোকা সরাল রানা। ঠিক সেই মুহূর্তে দেশলাইয়ের কাঠি আঙুলে ছ্যাঁকা দিয়ে নিভে গেল। 'উফ্! উফ্!' কাতরে উঠল রানা, গিল্টি মিয়াকে নিয়ে সামনের দিকে ছুটল, সোজা পরবর্তী চেম্বারে ঢুকছে।

ঠিক চৌকাঠ পেরোবার সময় ছোট্ট বোতামটা মাড়িয়ে দিল গিল্টি মিয়া। একটা মেকানিজম সচল হলো। বিরাট পাথুরে দরজা ঘর্ঘর করে গড়িয়ে এসে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

'যাহ্! সর্বনাশ!' বলেই ছুটে এসে পাথরটা ঠেলে সরাবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু ভারী পাথর এক চুলও নড়াতে পারল না।

বিফল হয়ে ঘুরছে রানা, দেখল গুহার উল্টোদিকের দরজাটা দ্রুত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।–সেই সঙ্গে সামনে থেকে আসা আবছা অলোটুকুও মুছে যাচ্ছে। আবার ছুটল রানা, কিন্তু পাথরের অসম্ভব ভারী দরজার বন্ধ হওয়া ঠেকাতে পারল না।

অন্ধকারে এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে চিন্তা করল রানা।

'সার কি এই অধমের ওপর রাগ করেচেন?' জিজ্ঞেস করল গিল্টি মিয়া।

'দূর বোকা!' বিপদের গন্ধ পাচ্ছে, বেশি কথা বলবার সময় কোথায় রানার। মেঝে হাতড়ে খানিকটা তেল চটচটে ন্যাকড়া পেয়ে তাতে আগুন ধরাল। লালচে শিখা নাচানাচি শুরু করল, তার আলোয় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখল রানা মানুষের খুলি আর কংকাল। 'নোড়ো না, বুঝলে!' সাবধান করে দিল রানা, চায় না অন্য কোনও মেকানিজম চালু হয়ে যাক। 'এক কাজ করো–ওদিকের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও।'

নির্দেশটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল গিল্টি মিয়া। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকাতেই আরেকটা বোতামে চাপ লাগল।

সিলিং থেকে লোহার চোখা সিক নেমে আসছে।

'ওহ্, নো!' গুঙিয়ে উঠল রানা। জ্বলন্ত ন্যাকড়ার আলোয় বল্লম আকৃতির লোহার সিকগুলোকে অত্যন্ত ভীতিকর লাগছে।

'আমার কোন দোষ নেই, সার···'

দরজার দিকে মুখ, চিৎকার শুরু করল রানা, গিল্টি মিয়ার কথায় কান নেই। 'শমি! নিচে নেমে এসো! শমি, তাড়াতাড়ি!'

নিজের কামরায় বসে রানার চিৎকার কোন রকমে শুনতে পেল শমি, এতই অস্পষ্ট। দ্রুত গাউনটা পরে নিল সে, লাফ দিয়ে ঢুকল টানেলে। 'রানা।' পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিচ্ছে। কিন্তু রানা আর ডাকছে না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শমি। তারপর ঘরে ফিরে এসে টেবিল থেকে ছোট একটা ল্যাম্প ও দেশলাই

নিয়ে আবার ঢুকল টানেলে। 'জানি আমার সারা শরীর নোংরা হয়ে গেছে' আপন মনে বিড় বিড় করছে।

কংকাল দুটো লাফ দিল। 'রানা!' চেঁচিয়ে উঠল শমি। 'এখানে দু'জন মানুষ পড়ে আছে!'

'আরও দু'জন মারা যাবে,' রানার জবাব ভেসে এলো, 'তুমি তাড়াতাড়ি না পৌঁছাও!'

বাতাসে পতপত করছে সেই ঘৃণ্য ছাল, হাত দিয়ে সরিয়ে ছুটছে শমি। বেয়ে নামল। বাতাসের ঝাপটা অনুভব করল চোখে-মুখে। হঠাৎ নিভে গেল ল্যাম্পটা। তারপর নাকে ঢুকল দুর্গন্ধ। 'ওয়াক! আমার বমি পাচ্ছে!'

'শমি, এখানে নেমে এসো!'

'তোমাদের দু'জনের বহু অত্যাচার আমি সহ্য করেছি, আরও কী করো তোমরা?' নিজেদের কি ভাবে ওরা? এটা কি আমার পেশা?

'শমি!'

সিলিং থেকে লোহার সিক ইতোমধ্যে অনেক নিচে নেমে এসেছে। কড় থেকে রড নয়, তলোয়ারের ফলার মত দেখাচ্ছে ওগুলোকে, কিনারা ধারাল ক্ষুর।

'অত চেঁচিয়ো না! আমি আসছি!' গলা চড়িয়ে বলল শমি।

'জলদি। আমাদের খুব বিপদ!' চিৎকার নয়, প্রায় গর্জন করছে রানা। তারপর গিল্টি মিয়াকে বলল, 'তোমার ছুরিটা দাও।' মেঝে যেখানে দেয়ালের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, উন্মাদের মত সেই জায়গাটা খুঁড়তে শুরু করল ছুরির ডগা দিয়ে।

'কি বিপদ?' জানতে চাইল শমি।

লোহার চোখা ও ধারাল সিক এখন মেঝে থেকেও ওপর দিকে উঠছে। 'বড় বিপদ!'

'রানা?' শমি একবারও না থেমে হাঁটছে। দুর্গন্ধ যত বাড়ছে ততই জোরাল শোনাচ্ছে রানার কণ্ঠস্বর।

'ব্যাপারটা সিরিয়াস!' রানার গলায় তাগাদা।

'এত ভয় পাওয়ার কি আছে!'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী। তাড়াতাড়ি করো, তা না হলে মরা মুখ দেখবে।'

'ছি, এ-সব অলক্ষুণে...' হঠাৎ পায়ের তলায় একাধারে পিচ্ছিল ও মচমচে অনুভূতি হলো শমির। 'ভগবান, এ কি!' দাঁড়িয়ে পড়ল, ফস্ করে একটা কাঠি জ্বালল দেশলাইয়ের।

পায়ের চারদিকে রাশি রাশি পোকা, কেঁচো, গিরগিটি, বিছা ইত্যাদি দেখে শমির ইচ্ছে হলো চিৎকার করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কিন্তু গলা থেকে চিঁ-চিঁ আওয়াজ বেরুল। 'রানা, আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও! এখানে শুধু পোকা আর...'

'শমি,' পাথুরে দরজার উল্টোদিক থেকে ব্যাখ্যা করল রানা, 'আমাদের এদিকটায় কোন পোকা-টোকা নেই।'

'দরজা খুলে আমাকে ভেতরে টেনে নাও!' মিনতি করল শমি।

'সিসটার,' গিল্টি মিয়ার গলা ভেসে এলো। 'আপনি দরজা খুলে আমাদের বাইরে টেনে নিন!'

'ভেতরে ঢুকতে দাও, রানা, প্লীজ!' শমি কেঁদে ফেলবে।

'দেখি। চেষ্টা করছি।'

'রানা, ওগুলো আমার চুলে ঢুকছে!' খুলিতে সত্যি সত্যি ঘর-বাড়ি বানাচ্ছে! সামনের দু'পা পরস্পরের সঙ্গে ঘষে আওয়াজ করছে! জাল বুনছে!

'কথা না বলে মন দিয়ে শোনো, শমি। খুঁজে দেখো, ওখানে নিশ্চয়ই একটা রিলিজ লিভার আছে।'

'কি আছে?'

'হাতল। ঘোরালে দরজাটা খুলবে।'

লোহার সিকের ডগাগুলো মাথার লেভেলে পৌঁছে গেছে।

'রানা, চুল থেকে ওগুলো কপাল বেয়ে নামছে।'

'চারদিকে খোঁজো, শমি! লুকানো কোন লিভার না থেকেই পারে না!'

'আমি শুধু দুটো গর্ত দেখতে পাচ্ছি!' কোঁপাচ্ছে শমি। 'টোকো!'

'গুড! এবার ডানদিকের গর্তে হাত ঢোকাও।'

এগিয়ে এসে বাঁ দিকের গর্তটায় হাত ঢোকাল শমি, কারণ দুটোর মধ্যে এটাই একটু কম অপরিষ্কার।

বাঁ গর্তের ভেতরে এগিয়ে এসে একটা হাত তার হাতটাকে ধরে ফেলল। রানার হাত। 'না, এই গর্তে নয়!' চিৎকার করছে রানা। 'তোমার ডানদিকের গর্তে!'

'ওটার ভেতরটা জ্যান্ত লাগছে। আমার বুঝি গা ঘিন ঘিন করে না! আমি পারব না!' প্রতিবাদ করল শমি।

'পারবে! পারতে তোমাকে হবে! ভেতরে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াও। হেলপ্ আস্, শমি!'

এরকম অনুনয় শমি অগ্রাহ্য করে কি করে। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে চিৎকার দিল সে। 'হে ভগবান, এত নরম কেন! আবার নড়ছেও! মনে হচ্ছে পচা আঙুর ভর্তি একটা গামলা।'

'শমি, আমরা এখানে মারা যাচ্ছি!'

'পেয়েছি! বোধহয় পেয়েছি!'

'বোধহয়?'

লিভারটা ধরে টান দিল শমি। পাথরের দরজা ঘর্ঘর করে সরে গেল একপাশে।

গিল্টি মিয়ার পাশে বসে রয়েছে রানা, দোরগোড়ার ভেতর। সিকগুলো ধীরে ধীরে ফিরে যেতে শুরু করল।

শমি মাথা থেকে পোকামাকড় খসাবার জন্যে চুলে আঙুল চালাচ্ছে। সারা গায়ে ওগুলো চরছে অনুভব করে শিউরে উঠল সে।

গিল্টি মিয়া ছুটল উল্টোদিকের দরজা লক্ষ্য করে। ওদিকের দরজাটাও ধীরে

ধীরে বন্ধ হচ্ছে। ভয় পেয়েছে সে, আর কিছু ঘটবার আগে এই জায়গা থেকে বেরিয়ে যেতে চায়।

শমি লাফাচ্ছে আর শরীর ঝাঁকাচ্ছে। 'আমার গা থেকে ফেলো ওকে! আমাকে ঢেকে ফেলছে! বাঁচাও!' তার এই লাফালাফির ফলে ট্রিগার মেকানিজম আরেকবার অন হয়ে গেল। গোটা ব্যাপারটা আবার নতুন করে শুরু হলো।

প্রথম দরজা গড়িয়ে এসে বন্ধ হয়ে গেল।

উল্টোদিকের দরজা থেকে গিল্টি মিয়া বলল, 'এটা আমার কাজ নয়। লক সিসটার। এদিকে আসুন, তাড়াতাড়ি বেরোন!'

তার দিকের দরজাও বন্ধ হচ্ছে, সেই সঙ্গে সিকগুলোও নেমে আসছে দ্রুত।

'হড়কে, সার! শরীলটাকে হড়কে দিন!'

শমির হাত ধরে ছুটল রানা। ওপর থেকে নেমে আসা দরজার ফাঁকে শমিকে ঠেলে দিল ও, তারপর পিছু নিয়ে হড়কে দিল নিজের শরীরটাও–বোধহয় আসার পথে মাথার হ্যাটটা শুধু হারাল। তারপর, দরজা নেমে আসতে যখন কয়েক ইঞ্চি বাকি, ভেতরে হাত গলিয়ে ছোঁ দিয়ে টেনে নিল হ্যাটটা।

লালচে, ঘোলাটে, ভৌতিক আলো। এটা একটা টানেল। কানে আসছে বাতাসের রোমহর্ষক হাহাকার।

আলোর উৎস, বাঁকটার দিকে এগোচ্ছে ওরা। থামল এসে টানেলের শেষ মাথায়। নিচের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল তিনজন।

নিচে প্রকাণ্ড একটা গুহা। নিরেট পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে ক্যাথেড্রাল-এর আদলে তৈরি গম্বুজ আকৃতির সিলিং, ঝুলে আছে সারি সারি পাথুরে স্তম্ভের মাথায়। ওরা একটা মৃত্যুপুরীর দিকে তাকিয়ে আছে। এটা একটা গোপন জায়গা। নিষিদ্ধ মন্দির।

গ্র্যানিট মেঝের ওপর পাথুরে ব্যালকনি ঝুলে রয়েছে, অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে স্তম্ভ ও খিলান। খিলানের ভেতর দিয়ে বিশাল গুহার অন্ধকার দিকগুলোয় যাওয়া যায়। ওই অন্ধকার থেকে মিছিলের মত বেরিয়ে আসছে উপাসকরা, সংখ্যায় তারা কয়েকশো, মন্দিরে ঢোকার সময় অনুচ্চকণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করছে। বাতাসের হাহাকারের সঙ্গে মিল রেখে, যেন একই ছন্দে সবাই মিলে কিছু একটা আবৃত্তি করছে লোকগুলো। কান পেতে থাকল রানা, গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে। তারপর ধরতে পারল।

'নাহি রাম, নাহি ভগবান, হামলোগ শায়তানকো দোস্ত মানতা। বাপ হো, গুরু হো, জো ভি হো, তুম শায়তানই সব হো! জ্যয় শায়তানকি! জ্যয় শায়তানকি!'

মন্দিরের ভেতর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথরের তৈরি স্ট্যাচু। জটাধারী সাধু-সন্ন্যাসীই শুধু নয়, প্রাচীন ঠগীদের মূর্তিও প্রচুর। আরও আছে মানুষের মুখ সহ সাপ, সিংহ ও বাঘের মূর্তি। মশালগুলো জ্বালা হয়েছে ব্যালকনির মাথার ওপর। নিচে, প্রকাণ্ড এক বেদির দিকে এগোচ্ছে মিছিলগুলো, সেটা মন্দিরের এক প্রান্তে। ওই বেদির কোথাও থেকেই লালচে আলোটা

বেরিয়ে আসছে। বাষ্প আর ধোঁয়াও উঠতে দেখা গেল। তবে বাতাসের কোন প্রবাহ ওই বাষ্প আর ধোঁয়াকে টেনে নিচ্ছে বলে মনে হলো।

পুরোহিতরা দাঁড়িয়ে আছে বেদির চারপাশে, হাতে রুপোর ট্রে, সেগুলো থেকে ধূপ ও ধুনোর ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ওগুলো পুড়ে নিঃশেষ হবার পর ধোঁয়ার মেঘ কেটে গেল। এতক্ষণে বেদির ওপর তৈরি করা পাথরের মূর্তিটা দেখা গেল।

ঠিক এই রকম একটা মূর্তি আগেও দেখেছে ওরা। কালীর বিকল্প হিসেবে এই পুরুষমূর্তি তৈরি করা হয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। এ হলো শয়তান, অর্থাৎ তার কল্পিত মূর্তি। দশটা মাথার আইডিয়া কোত্থেকে পেয়েছে এটা যেমন সহজেই অনুমেয়, তেমনি এ-ও অনুমান করা কঠিন নয় যে শয়তানের হাত দশটা কেন। তবে গিরিপথের প্রবেশমুখে যে শয়তানের প্রতিকৃতি ওরা দেখে এসেছে, এটার আকার তার চেয়ে অন্তত তিন গুণ বড়। প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু। তার পা পেঁচিয়ে ধরেছে সাদা-কালো ডোরা-কাটা সাপ। দশটা হাতের একটায় কাটা মুণ্ডু–সত্যিকার মানুষের মুণ্ডু বলেই মনে হলো, টপ টপ করে রক্ত ঝরছে। আরেক হাতে প্রকাণ্ড ভোজালি। তৃতীয় ও চতুর্থ হাত বেদির কিনারা ধরে আছে। পঞ্চম হাতে চেইন লাগানো লোহার ফ্রেম দিয়ে তৈরি বাস্কেট বা ঝুড়ি। শয়তানের গলায় মানুষের খুলি দিয়ে তৈরি মালা পরানো হয়েছে।

শয়তানের মুখ অর্ধেকটা মুখোশে ঢাকা। তার চোখ আর মুখের একটা পাশ নিচের ফাটল থেকে উঠে আসা গলিত লাভার আভায় উদ্ভাসিত, সারাক্ষণ তাপের সংস্পর্শে থাকায় দাঁত ও জিভ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। নাক নেই, নাকের জায়গায় বিকৃত একটা গর্ত।

পুরোহিতরা মুগ্ধ, সম্মোহিত দৃষ্টিতে শয়তানের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উপাসকরা আরও জোরে মন্ত্র পড়ে শয়তানের উপাসনা শুরু করল।

বাতাস ভরা টানেলে শিউরে উঠল শমি। 'কি ঘটছে বলো তো?' ফিসফিস করল সে। অজানা ভয়ে তার অন্তরাত্মা কেঁপে গেছে।

'এ হলো বিপথগামী তান্ত্রিক আর ঠগীদের উৎসব,' অনুমান করে জবাব দিচ্ছে রানা। 'এরা শয়তানের উপাসক।'

রানা থামতেই হঠাৎ অমানবিক একটা আর্তনাদ শোনা গেল–অমানবিক অথবা অতি মানবিক। 'বাচাও! মুঝে বাচাও! বাচাও, কোঈ মুঝে বাচা লো!' 'কে! কে অমন চিৎকার করে?' শমি থরথর করে কাঁপছে।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল চিৎকারটা। এরপর প্রকাণ্ড একটা ড্রামে বাড়ি পড়ল–পরপর তিনবার। মন্ত্র পড়া বন্ধ হয়ে গেল। এখন শুধু বাতাসের বিলাপ শোনা যাচ্ছে। এই সময় ধোঁয়ার ভেতর থেকে হাজির হলো প্রধান পুরোহিত–শুকদেব ধাওয়ান। ডিনারের সময় রানার পরিচয় হয়েছে এর সঙ্গে।

ধাওয়ান কালো আলখেল্লা পরে আছে। টকটকে লাল চোখ দুটো গর্তে ঢোকা। মানুষের অসংখ্য দাঁত দিয়ে তৈরি তিন প্রস্থ মালা ঝুলছে গলায়। মাথায়

মোষের খুলির ওপরের অংশ বসানো, শিংগুলো বাঁকা ও মোচড় খাওয়া।

হেঁটে এসে গভীর গহ্বরের কিনারায়, ফাটলটার সামনে দাঁড়ি[illegible] পুরোহিত শুকদেব ধাওয়ান, পূজারী বা উপাসকদের দিকে মুখ করে [illegible] আরেক প্রান্তে, প্রধান পুরোহিতের দিকে মুখ, পরিচিত একজনকে বসে [illegible] দেখল রানা। 'দেখো,' নিচু গলায় শমিকে বলল। 'আমাদের হোস্ট, [illegible] পবনম বৈশাখম।'

মাথার ওপর একটা হাত তুলল শুকদেব ধাওয়ান। আবার বেদির [illegible] থেকে রোমহর্ষক একটা আর্তনাদ ভেসে এলো—আওয়াজটা যেন [illegible] শয়তানের মুখ থেকে বেরুচ্ছে।

তবে একটু পরেই আর কোন রহস্য রইল না। শুকদেব ধাওয়ান [illegible] পিছন থেকে একজন লোককে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এসে চৌকো লোহার [illegible] দিয়ে তৈরি বাস্কেটের সঙ্গে বেঁধে ফেলল, যে বাস্কেটটা শয়তানের একটা [illegible] থেকে ঝুলছে—পাথুরে মেঝের ঠিক ওপরে।

সবাই নিঃশব্দে তাকিয়ে।

ঝুলন্ত ফ্রেমে চিৎ হয়ে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে শুকদে[illegible] ধাওয়ানের অসহায় শিকার, বাঁধন খোলার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ছে, [illegible] মোচড়াচ্ছে, চিৎকার করছে। বিড়বিড় করে কি একটা মন্ত্র পড়ল ধাওয়ান [illegible] ডুকরে কেঁদে উঠল লোকটা। ধাওয়ান লোকটার দিকে একটা হাত বাড়াল: [illegible] সেই হাত বন্দির বুক চিরে ফেলল।

চিরে ফেলল, ডুবে গেল ভেতরে; ধড়ে খিঁচুনি উঠে গেছে—তারপর [illegible] থেকে মুচড়ে বের করে আনল অভাগার সচল হৃৎপিণ্ডটা।

শমি দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকল।

গিল্টি মিয়া পালাতে চেষ্টা করায় রানা খপ করে তার ঘাড় ধরে বাধা দি[illegible]

'জাদু তো অনেকই দেকেচি, সার। কিন্তুক এটা খারাব জাদু। শেকা থাক[illegible] আমিও দেকাতে পারতুম...'

'চুপ!' অলৌকিক কিছুতে রানার বিশ্বাস নেই। কিন্তু নিজের চোখে দে[illegible] ঘটনা অবিশ্বাস করে কিভাবে! যা দেখেছে, ওর জন্যে তার চেয়েও বড় বি[illegible] অপেক্ষা করছিল। 'লোকটা এখনও বেঁচে আছে,' বিড়বিড় করল ও।

সত্যি তাই। লোকটা আবার চিৎকার করে উঠল। ওদিকে তার হৃৎপি[illegible] শুকদেব ধাওয়ানের হাতে নির্দিষ্ট ছন্দে ঘন ঘন কোঁচকাচ্ছে। প্রধান পুরোহি[illegible] তার হাত মাথার ওপর তুলল। সেই সঙ্গে আবার শুরু হলো শয়ত[illegible] উপাসকদের মন্ত্রপাঠ: 'নাহি রাম, নাহি মা কালী, নাহি ভগবান, হামলো[illegible] শায়তানকো দোস্ত মানতা!...জ্যয় শায়তানকি!'

বলির পাঁঠা, বেচারি লোকটা এখনও কাঁদছে—পুরোপুরি জীবিত। তার [illegible] ক্ষত বলে কিছুই নেই। শুধু লালচে একটা দাগ, শুকদেব ধাওয়ানের হাত[illegible] যেখানে ঢুকেছিল।

লোহার ফ্রেমে চেইন পরাল শুকদেব ধাওয়ান, তারপর ফ্রেমটা উল্টো [illegible] দিল, ফলে লোকটা এখন নিচের দিকে মুখ করে মেঝেতে তৈরি বিশাল [illegible]

পাথরের দরজার সরাসরি ওপরে ঝুলে থাকল। দরজাটা কর্কশ আওয়াজ তুলে খুলে যাচ্ছে, তার নিচে উন্মোচিত হচ্ছে সেই একই গহ্বর, যে গহ্বর বেদির সামনের ফাটলের নিচেও দেখা যাচ্ছে—লাল লাভা টগবগ করে ফুটছে।

তারপরই লোহার ফ্রেমটা গহ্বরে নামানো হলো।

দুর্ভাগা লোকটা দেখল চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল লাল গলিত পাথর তার দিকে উঠে আসছে। তার হৃৎপিণ্ড শুকদেব ধাওয়ানের হাতে সেই স্বাভাবিক ছন্দে এখনও লাফাচ্ছে। উপাসকরা মন্ত্রপাঠে বিরতি দিচ্ছে না। বাতাসের হায় হায় ধ্বনি এখন আরও জোরাল। দুনিয়ার বুকে এটাই তার শেষ শোনা আওয়াজ।

তার পশম পুড়ে যাচ্ছে। চামড়ায় ফোস্কা পড়ছে। ফোস্কা গলে গলে খসে পড়ছে। চুলে দপ করে আগুন ধরে গেল। চিৎকার করতে চাইল সে। কিন্তু আগুনের হল্কায় ফুসফুস ভরে উঠেছে। দগ্ধ গলা থেকে কোন শব্দ বেরুতে পারল না।

অবশেষে ফ্রেমটা ডুবে গেল ফুটন্ত লাভায়।

বেদির পাশে দাঁড়িয়ে হৃৎপিণ্ডটা উঁচু করে ধরে আছে শুকদেব ধাওয়ান। সেটা এখনও তাজা ও সচল। ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে। তারপর ধোঁয়া বেরুতে শুরু করল। হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল ওটা। পরমুহূর্তে, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উইঞ্চের সাহায্যে লোহার ফ্রেমটা তোলা হলো। সেখানে বন্দী লোকটার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। পুড়ে শুধু ছাই নয়, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সে।

শমি কেঁদে ফেলল।

শুকদেব ধাওয়ান বেদির পিছনে চলে গেল। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো তিনজন পুরোহিত, কাপড়ে মোড়া কি যেন বয়ে নিয়ে আসছে বেদির দিকে।

স্ফটিকের মত দেখতে স্বচ্ছ তিনটে পাথর থেকে কাপড়ের আবরণ সরাল তিন পুরোহিত, অতি যত্নের সঙ্গে নিচু করল শয়তানের মূর্তির সামনে। মূর্তির পায়ের মাঝখানে চার ফুট উঁচু একটা পাথুরে খুলি রয়েছে, চোখ আর নাকের জায়গায় শুধু গর্ত। স্বচ্ছ শুভ্র পাথর তিনটে ওই খুলির সামনে এক জায়গায় জড়ো করল পুরোহিতরা। অকস্মাৎ আলোকিত হয়ে উঠল ওগুলো। আলোর উৎস পাথরগুলোই, প্রতিটির ভেতর যেন আগুন ধরে গেছে। পুরোহিতরা আবার আলাদা করতেই ভেতরের উজ্জ্বলতা সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। একই কাজ আরেকবার করা হলো। আবার আশ্চর্য আলো ছড়াচ্ছে প্রতিটি স্ফটিক। বেদির সামনে একসঙ্গেই রাখা হলো ওগুলোকে। মন্দির ছেড়ে চলে যাচ্ছে সবাই।

রানা বিস্ময়ে বিমূঢ়। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া? কোনও ধরনের চালাকি? স্রেফ ম্যাজিক হওয়া অসম্ভব নয়। তবে শয়তানের উপাসকরা বোধহয় জানে না যে কথিত আছে শিব স্বয়ং কোন এক মুনিকে বর হিসেবে দান করেছিলেন পাথরগুলো।

'অন্ধকারে জ্বলচে কিকরে, সার?' গিল্টি মিয়া জিজ্ঞেস করল।

'কি জানি! ভেতরে হয়তো হীরে আছে, স্ফটিকগুলো এক করলে ওই হীরে থেকে আলো ঠিকরে বেরোয়।'

'হীরে?' চোখের পানি মুছে নিজেকে সামলে নিল শমি। কনুই দিয়ে গুঁতো মারল রানার পাঁজরে। 'সত্যি?'

পুরোহিতরা সেজদা দেয়ার ভঙ্গিতে অর্থাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে—পাথরগুলোকে, নাকি শয়তানের মূর্তিটাকে, বলা মুশকিল। রানা পুরোহিতরাও অনুকরণ করছে তাদেরকে।

'শোনো, তোমরা কেউ এখান থেকে নড়বে না,' শমি আর গিল্টি মিয়াকে বলল রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে ওর হাতে শোল্ডার ব্যাগটা তুলে দিল গিল্টি মিয়া। চেইনের ফাঁক দিয়ে হাতল বেরিয়ে থাকতে দেখে রানা বুঝল, বারো ফুট লম্বা চাবুকটা মৃত গার্ডের গলা থেকে খুলে ভরে দিয়েছে গিল্টি মিয়া ওর ব্যাগে।

রানা পা বাড়াবার আগেই শমি বলে উঠল, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে, শুনি?'

টানেলের কিনারা থেকে ঝুঁকে নিচের পাথুরে মেঝেতে তাকাল রানা। 'ওখানে।' ইতোমধ্যে নিচের মন্দির পুরোপুরি খালি হয়ে গেছে।

'ওখানে? নিচে?' জোড়া ভুরু কপালে উঠল ওর। 'এই, তুমি কি বদ্ধ উন্মাদ? জানো, তোমাকে পেলে কি করবে ওরা? ওই বেদিতে ফেলে স্রেফ বলি দিয়ে দেবে।'

'ওই পাথরগুলো আমার চাই,' বলল রানা।

হঠাৎ খেপে উঠল শমি। 'আমরা কেউ না? আমাদেরকে ফেলে তুমি লোভের বশে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ?'

'গিল্টি মিয়া, তোমার স্নেহের সিসটার রইল, দেখেশুনে রেখো,' বলে আর অপেক্ষা করল না, টানেলের কিনারা থেকে দেয়াল বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল রানা। নামতে বিশেষ কোন সমস্যা হচ্ছে না, দেয়ালের গায়ে ফাটল ও গর্তের কোন অভাব নেই।

প্রকাণ্ড গুহার পিছন দিকটায়, একটা স্তম্ভের গায়ে ঝুলে পড়ল রানা, সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিচে নামছে। তারপর পা রাখল পাথুরে কেউটের মাথায়, সিংহের মূর্তিতে, নিষ্প্রাণ নর্তকীদের কাঁধে। এভাবে শেষ পর্যন্ত কোন বিপদ না ঘটিয়েই মন্দিরের মেঝেতে নেমে এলো।

নিঃশব্দ পায়ে গুহার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় চলে এলো রানা। ফাটলটার কাছে এসে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাতে মন্দিরের তরল আত্মা দেখতে পেল। আগুন ওখানে বুদ্বুদ তৈরি করছে। ধোঁয়া আর আঁচে চোখ আর নাকের ভেতর জ্বালা করে উঠল। পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো রানা।

ফাটলটার ওদিকে শয়তানের বিশাল মূর্তি, আর মূর্তির সামনে কাপড়ে মোড়া তিনটে ম্যাজিক স্টোন। ফাটলটা এত চওড়া যে লাফ দিয়ে পার হতে যাওয়ায় ঝুঁকি আছে। এদিক ওদিক তাকাল রানা। না, ওপারে যাবার অন্য কোন পথও নেই।

তারপর চোখ পড়ল গহ্বরের ওপারে, জোড়া স্তম্ভের দিকে। বেদির দু'পাশে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো, মাথায় একটা করে হাতির মূর্তি। কুণ্ডলী পাকানো চাবুকটা খুলল রানা, তারপর উড়িয়ে দিল ক্ষিপ্রবেগে।

বাতাসে সপাং করে আওয়াজ করল চাবুক। পাথুরে একটা হাতির সাদা দাঁতে ওটার শেষ প্রান্ত জড়িয়ে গেল। হাতল ধরে টানল রানা, চামড়া টান টান করল, তারপর বড় করে শ্বাস নিয়েই ছুটল গহ্বর লক্ষ্য করে।

কিনারায় পৌঁছে লাফ দিল রানা। গহ্বরের ওপর উড়ছে ও। পার হয়ে এসে ত্রিশ ফুট উঁচু শয়তানের সামনে মেঝেতে নামল। চাবুকটাকে বার কয়েক ঢেউ খেলিয়ে ছাড়িয়ে নিল হাতির দাঁত থেকে। প্রশংসার দৃষ্টিতে চাইল ওটার দিকে : বাহ! কাজের জিনিস তো!

টানেলের কিনারা থেকে হাত নেড়ে সংকেত দিল গিল্টি মিয়া–অল ক্লিয়ার। কোমরে চাবুকটা পেঁচিয়ে রেখে বেদির দিকে ফিরল রানা। পাথর তিনটে এখনও আগের মত উজ্জ্বল আভা বিকিরণ করছে। সাবধানে এগোল।

কাছ থেকে ভাল করে পরখ করার জন্যে ঝুঁকল রানা। তিনটে পাথরে সূক্ষ্ম কিছু রেখা আঁকা রয়েছে। দেবলিঙ্গমের বর্ণনা অনুসারে, এই পাথরগুলো স্বপ্নপুরী থেকে চুরি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে পাথর ছিল পাঁচটা, বাকি দুটোর কোথায় ঠাঁই হয়েছে কে জানে।

ছুঁতে ভয় লাগছে রানার, এত উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। তবে সাহস করে ছোঁয়ার পর আঙুল পুড়ল না। সাবধানে মাঝখানের পাথরটা চোখের সামনে তুলল ও। ভাল করে দেখছে।

পাথরের ভেতর একটা বড় আকৃতির ম্যাজিকাল ডায়মন্ড লুকিয়ে আছে। ওটার আলো যেন অপার্থিব, সম্মোহিত করে ফেলে। এই সৌন্দর্যের কোন বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। রঙধনুর সবগুলো রঙ যতটা সম্ভব গাঢ় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু নিঃসঙ্গ হওয়ার একটু পরেই নিষ্প্রভ হতে শুরু করল উজ্জ্বল আভা। পাথরটা বাকি দুটোর কাছে নামাল রানা। আবার সেটা রঙচঙে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এবার তিনটে পাথরই পাউচে ভরে রাখল রানা। সিরিকিত লবডং-এর কাছ থেকে শমির নিয়ে আসা হীরেটাও ওই পাউচে রয়েছে।

টানেলের কিনারা থেকে শমি আর গিল্টি মিয়া রানাকে দেখছে।

দেখছে শয়তানও।

রানা পিছু হটছে, অপলক চোখে তাকিয়ে আছে ভীতিকর মূর্তিটার দিকে। মাটির তৈরি মরণশীল প্রাণীটার উদ্দেশে হঠাৎ কথা বলে উঠল শয়তান।

পিছন দিকে লাফ দিল রানা। মূর্তির মুখে যেন শয়তানি হাসি ফুটছে। তারপর কর্কশ অট্টহাসির আওয়াজ চমকে দিল ওকে, প্রতিধ্বনি তুলল চারদিকে।

এক মিনিট! শব্দগুলো মনে হলো বেদির পিছন থেকে আসছে, মূর্তির কোন মুখ থেকে নয়। খুক করে কেশে নিজের উদ্দেশেই ক্ষীণ একটু হাসল রানা। ঘুরে বেদির পিছনে চলে আসছে ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে।

বেদির পিছনে রানা অদৃশ্য হয়ে যেতেই উদ্বেগে শমি গিল্টি মিয়ার, গিল্টি মিয়া শমির একটা করে হাত চেপে ধরল। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে আলাপ করছে ওরা, এমনি সময়ে প্রকাণ্ডদেহী তিনজন ঠগী লাফিয়ে পড়ল ওদের ওপর। ছোট্ট ছুরিটা বের করার সময় পেল গিল্টি মিয়া, শমিকে রক্ষার জন্যে চালাতেও পারল। প্রকাণ্ডদেহী এক ঠগী নিজের হাতের লম্বা ক্ষতটার দিকে

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। অপর ঠগী শমিকে ধরে ফেলেছে। তবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রাণপণে টানেল ধরে ছুটল শমি। চিৎকার করছে, 'বড়ভাই, দৌড়াও! বড়ভাই, দৌড়াও!'

কিন্তু দুই ঠগী নাগালের মধ্যে পেয়ে গিল্টি মিয়াকেই ধরে রাখল। 'কিন্তু আপনি পেলিয়ে যান! দেকেন কোতাও থেকে কিচু সাহায্য পান কিনা।'

বিশ ফুট ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে শমি। ইতস্তত করছে।

'সারের দোহাই লাগে!' চিৎকার করছে গিল্টি মিয়া। 'অন্তত ওনার কথা ভেবে নিজেকে রক্ষে করুন!'

ঘুরেই ছুটল শমি। নিজের বা আর কারও জন্যে নয়, গিল্টি মিয়ার কথা ভেবে কাঁদছে সে।

বেদির পিছনে অন্ধকার গুহার ভেতর ঢুকল রানা। এখানে আলো আসছে দু'দিক থেকে। মন্দিরের নিচে ফুটন্ত লাভার আভা থেকে, মূর্তির গায়ে লাগবার পর প্রতিফলিত হচ্ছে; দ্বিতীয় আলোটা আসছে সামনে ও ওপর দিক থেকে–হলুদ আলোর নিষ্প্রভ একটা টানেল বা শাফট, যেন মেঝের কোন গর্ত থেকে উঠে সিলিং ছুঁয়েছে।

একটা সরু ব্রিজ পেরিয়ে গর্তটার দিকে এগোচ্ছে রানা। কিসের ওপর ব্রিজ, অন্ধকারে বোঝার কোন উপায় নেই। তবে পার হতে কোন সমস্যা হলো না। বিরাট ফাঁকটার দিকে এগোচ্ছে, লোকজনের কণ্ঠস্বর আর পাথরের সঙ্গে ধাতব বস্তুর ঘষা খাওয়ার শব্দ কানে এলো। কিনারায় পৌঁছে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল রানা।

নিচে বিশাল একটা গহ্বর। গহ্বরের চারদিকে অসংখ্য টানেলের মুখ। পিঁপড়ের মত সারি সারি শিশু শ্রমিক ওই টানেলে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে, পিঠে পাথর ভর্তি চটের বস্তা। আরও একদল ছেলে, এরা বয়সে একটু বড়, সেই পাথরভর্তি বস্তাগুলো টেনে নিয়ে এসে মাইন কার-এ তুলছে। মাইন কারগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে রেললাইনের ওপর।

নিচে ওটা একটা খনি। নগ্ন বালব দেয়ালে দেয়ালে ভৌতিক ছায়া তৈরি করেছে। যেদিকটায় খনন কাজ চলছে, গহ্বরের শেষ প্রান্তে, খাড়া একটা পানির প্রবাহ দেয়ালকে আলিঙ্গন করে আছে–নিচে বিরাট একটা জায়গা ডুবে গেছে, উপচে পড়ছে কালো, চকচকে জল। মেশিনের যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে আসছে রানার কানে। বাতাসে ভেসে আছে হালকা ধোঁয়া। পাথরের ফাটলগুলো থেকে আগুনের আভা বেরিয়ে আসছে। পাথরের সঙ্গে লোহার ঘষা লেগে রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ ছুটছে চারদিকে।

শিশু-কিশোররা কেউ কেউ কাজ করার ফাঁকে চোখের জল মুছছে। অনেককেই ফোঁপাতে দেখা গেল। কোন সন্দেহ নেই, এরা সবাই স্বপ্নপুরী বা আশপাশের গ্রাম থেকে ছিনিয়ে আনা বাচ্চা। ঠগী গার্ডরা কারণে-অকারণে চাবুকপেটা করছে তাদের, লাথি মেরে ফেলে দিচ্ছে, পাঁজরে গুঁতো মারছে বুটের ডগা দিয়ে।

একটা বাচ্চা, বয়স হবে সাত কি আট, হাতজোড় করে মাফ চাইল–বস্তা টেনে টেনে পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে, একটু বিশ্রাম দাও, মালিক! জবাবে শুরু হলো লাথি ও চাবুকের মার।

দৃশ্যটা রানার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ঠগী গার্ড নিশ্চয়ই তার পিঠে ওর দৃষ্টির আঁচ অনুভব করেছে, তা না হলে ঝট করে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাত না। ওকে দেখে কোদাল আকৃতির দাঁত বের করে হাসল সে। তারপর, রানাকে আরও উত্তেজিত করার জন্যে একের পর এক লাথি মারতে লাগল বাচ্চা ছেলেটাকে।

রানার সুযোগ আছে এই জায়গা ছেড়ে চলে যাবার। ওই কসাই অনেক নিচে, ওর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। কিন্তু ও তো আর অমানুষ নয়, কাজেই কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে এক সেকেন্ডও লাগল না ওর।

ঝুঁকল রানা, বেশ ভারী একটা পাথর নিয়ে সিধে হলো, তুলল মাথার ওপর, তারপর লক্ষ্যস্থির করে ছুঁড়ল পাষাণহৃদয় ঠগীর দিকে।

মেঝের কাছাকাছি নিশ্চয়ই প্রচণ্ড গতি নিয়ে পৌঁছেছে পাথরটা। কিন্তু গার্ড লোকটা ধরে ফেলল। ধরে ফেলল প্রায় অনায়াসেই। একটু ঝুঁকতে হলো তাকে, তবে তখনি সিধে হলো সে, চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল। আবার এক হলো ওদের চোখ, আবার হাসল লোকটা–তবে এবার রানার চেহারা স্মৃতিতে গেঁথে নিচ্ছে সে।

চমকে ওঠা শিশু শ্রমিকরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মুখ তুলে। কারও কারও ঠোঁট অভিমানে ফুলে উঠতে চাইছে। কারও কারও চোখে ফুটে উঠতে চাইছে প্রত্যাশার আলো। হয়তো ভাবছে, ঈশ্বর কাউকে পাঠিয়েছেন তাদেরকে মুক্ত করার জন্যে।

আরও একটা পাথর খুঁজছে রানা, এই সময় ঘাবড়ে দেয়ার মত একটা ঘটনা ঘটতে শুরু করল। গহ্বরের কিনারা থেকে ধুলো আর কাঁকর খসে পড়ছে। আসলে ছোট মাপের ল্যান্ডস্লাইড বা ভূমিধস।

আর তারপরই, ভাগ্যের লিখন খণ্ডায় কে, শুরু হলো বড় মাপের ভূমিধস। রানাকে নিয়ে, রানার চারপাশে।

লাফ দিয়ে পিছু হটল রানা। নিয়তি যেন বলতে চাইল–'দুঃখিত, কোন লাভ নেই।' গহ্বরের কিনারা নয়, গোটা মেঝের পতন ঘটছে। ধুলো আর কাঁকর, তার সঙ্গে পাথরের টুকরো ও শুকনো কাদা, ওগুলোর সঙ্গে রানা–সব একযোগে নেমে এলো দশ ফুট, বিশ ফুট, তারপর ত্রিশ ফুট নিচের কারনিসে, সেখান থেকে মেঝেতে।

আবর্জনার স্তূপে বসে আছে রানা। সাদা পাউডার মাখা একটা ভূত। হাত-পায়ের চামড়া ছড়ে গেছে। তবে কোন হাড় পাঁজরা ভাঙেনি। সঙ্গে পাউচটা নেই, নেই কাঁধের ব্যাগটাও।

ঠগী গার্ডরা ঘিরে ধরল ওকে। আরও প্রকাণ্ড লাগছে লোকগুলোকে, আক্রোশে কাঁপছে। সবচেয়ে বড় দৈত্যটার দিকে তাকিয়ে হাসল রানা। জানতে চাইল, 'এই, তুমি এত কুৎসিত হলে কি করে, বলো দেখি?'

নয়

গার্ডরা কয়েকজন মিলে ধরল রানাকে, টেনে-হিঁচড়ে ছোট একটা কয়েদখানা সেল-এ নিয়ে এসে আটকাল, তারপর বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল। নিজেদের কাজ খুব ভাল বোঝে, নিচু ছাদের সঙ্গে চেইন দিয়ে ওর কব্জি বাঁধতে ভোলেনি।

সেলের ভেতর আরও তিনজন বন্দি রয়েছে, এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছিল তারা। দরজায় তালা পড়তে ছুটে রানার কাছে চলে এলো। দু'জন স্থানীয় বালক। অপরজন বয়স্ক শিশু—গিল্টি মিয়া।

'সব একেবারে ন্যাজেগোবরে হয়ে গেল, স্যার! আপনাকে আমার পাওয়া হলো, আমাকেও আপনার পাওয়া হলো, কিন্তুক এদিকে আবার দু'জনকেই পেয়ে বসেচে শয়তানের চেলারা। গলায় ফাঁস লাগিয়ে...'

'শমি কোথায়?'

বিষণ্ণ গিল্টি মিয়া মাথা নাড়ল। 'আমি আমার সিসটার হারিয়েচি, আপনি হারিয়েচেন—আল্লাই মালুম কাকে!'

'ওরা কারা?' গিল্টি মিয়ার পাশে বসা দুই ছেলেকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

ডান পাশের ছেলেটাকে দেখিয়ে গিল্টি মিয়া বলল, 'ওর নাম অনন্ত বদরী, স্বপ্নপুরীর ছেলে। কিচু কিচু হিন্দি তো বুজিই, বলচে—খনিতে মাটি খোঁড়ার জন্যে গ্রাম থেকে তাকে জোর করে ধরে এনেচে ঠগীরা।'

'কিন্তু এই বয়সী বাচ্চাদের কেন?' রানা বুঝতে পারছে না।

'বাচ্চারা ছোট,' জবাব দিল অনন্ত বদরী, হাবভাব দেখে সে-ও এদের প্রশ্ন বুঝে নিয়ে জবাব দিচ্ছে। 'তাই সরু টানেলের ভেতর আমরা কাজ করতে পারি।'

'তাহলে তোমাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে কেন?'

'কাজে ফাঁকি দেয়ার শাস্তি ভোগ করছি আমি,' ছেলেটা ফুঁপিয়ে উঠল। তারপর ইঙ্গিতে সঙ্গীকে দেখাল সে। তার বয়স একটু বেশি, স্বাস্থ্যও ভাল। 'ওর নাম অর্জুন রঙ্গনাথন। বয়েসে বড় হয়ে গেছে। তাই ওকে বন্দি করে রেখেছে। শয়তানকে খুশি করার জন্যে বলি দেয়া হবে ওকে।' আবার ফুঁপিয়ে উঠল অনন্ত বদরী। 'হয়তো আমাকেও...'

'এ-কথা কেন বলছ?'

'এর আগে তাই তো দেখেছি,' জবাব দিল অর্জুন রঙ্গনাথন। 'বয়স বেশি হয়ে গেলে যারা টানেলে ঢুকতে পারে না তাদেরকে শয়তানের মূর্তির সামনে বলি দেয়া হয়। খুব বেশি কাজে ফাঁকি দিলেও একই শাস্তি...'

'তবে সবাইকে আবার বলি দেয়া হয় না,' বলল অনন্ত বদরী। 'অনেককে

দেখেছি শয়তানের রক্ত পান করিয়ে ঠগী বানানো হয়। ভগবান, তার আগে তুমি আমাকে মৃত্যু দিয়ো!'

এই সময় দু'জন গার্ডকে দেখা গেল। সেলের তালা খুলছে তারা। ভয়ে ফুঁপিয়ে উঠে এক কোণে পালাল বাচ্চা দুটো। তবে গার্ড দু'জন রানা ও গিল্টি মিয়াকে নিতে এসেছে।

চেইন খুলে রানা ও গিল্টি মিয়াকে সেল থেকে বের করা হলো। আঁকাবাঁকা পথ গহ্বরের দেয়াল ধরে ওপরে উঠে গেছে। তারপর একটা টানেল ধরে এগোল ওরা। শেষ মাথায় ভারী কাঠের দরজা দেখা গেল। পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে বন্দিদের ভেতরে ঢোকানো হলো।

এটা প্রধান পুরোহিত শুকদেব ধাওয়ানের চেম্বার।

জায়গাটাকে আতংক সৃষ্টিকারী একটা গ্যালারি বললেও চলে। সম্ভাব্য কুৎসিততম শত শত মূর্তি সাজানো রয়েছে দেয়াল কেটে তৈরি করা খোপে। পাথরের দেয়ালগুলোও কেমন যেন বিকৃত, ওদের দিকে অশুভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মেঝেতে ফাটল ও ফুটো আছে, ভেতর থেকে লাল বাষ্প উঠে আসছে, গুহার ভেতরটাকে ভরে দিচ্ছে তীব্র দুর্গন্ধে। ওদের বমি পেল।

এক কোণে লোহার একটা পাত্র, কানায় কানায় ভর্তি জ্বলন্ত কয়লা আর অদ্ভুত কোন ধূপ। রাঙানো ঠোঁট নিয়ে এক লোক ওই কয়লার আগুনটাকে মাঝেমধ্যে লোহার সিক দিয়ে খোঁচাচ্ছে। সারাক্ষণ গুনগুন করে কি যেন গাইছে সে।

কামরার আরেক দিকে বারো ফুট লম্বা কুৎসিত একটা মানুষের মূর্তি দেখল রানা। মূর্তির মাথার আকৃতি হুবহু সাপের ফণা। দেহটা পুরুষের, তবে কোন ঘাড় নেই, বাহু নেই। ফণার মাথায় মোমবাতি জ্বলছে। মোমের আলোয় মূর্তির নাভি থেকে রক্ত গড়াতে দেখল রানা।

এই কদর্য মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ডদেহী সেই ঠগী গার্ড নিঃশব্দে হাসছে নিষ্ঠুর হাসি। হ্যাঁ, একে লক্ষ্য করেই পাথরটা ছুঁড়েছিল রানা। লোকটা ধরে ফেলে। এখন সে রানাকে ধরবে।

কামরার মাঝখানে পদ্মাসনে বসে রয়েছে শুকদেব ধাওয়ান। মাথায় মোষের শিং। জোড়া শিং-এর মাঝখানে মানুষের শুকনো খুলি। লোকটার মুখে নানা রঙের বিচিত্র সব নকশা আঁকা। তার গা থেকে ঘামের যে গন্ধটা আসছে, ঠিক যেন পচা মাছ।

চোখ মেলল প্রধান পুরোহিত। 'আমি শুকদেব ধাওয়ান। 'তোমরা পবিত্র রত্ন চুরি করতে এসে ধরা পড়েছ।'

'সন্ধি করবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এসো, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই হই।'

পাথরগুলো নিজেদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এতক্ষণ ওগুলোর ওপর চোখই পড়েনি রানার। কুৎসিত মূর্তিটার পায়ের কাছে রাখা হয়েছে পাউচ থেকে বের করে। আলো ছড়াবার কারণ যেন...প্রধান পুরোহিতের রাগের প্রতিক্রিয়া।

'শুরুতে রত্ন ছিল পাঁচটা,' বলল শুকদেব ধাওয়ান। 'কয়েক শতাব্দীর মধ্যে দুটো রত্ন হারিয়ে গেছে। চুরি করেছে তোমাদের মত কোন চোর, তবে চুরি করেছে, নিয়ে পালাতে পারেনি। ব্রিটিশরা হানা দিতে আসছে শুনে ঠগীদের গুরু বলরাম ঠাকুর এই গোলকধাঁধার ভেতরই কোথাও লুকিয়ে রাখে।'

হঠাৎ করে রানা বুঝতে পারল শিশু-কিশোরদের ওপর কেন এই অমানবিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। 'ও, তাহলে বাচ্চাদের দিয়ে মাটি খোঁড়াবার এটাই কারণ, পাথর দুটো খোঁজা হচ্ছে।' রাগে আবার রানার শরীর জ্বালা করছে।

'ওরা হীরে বের করছে,' শুকদেব ধাওয়ান বলল। 'এটা আমাদের খরচ তোলার একটা উপায়। মহৎ কোনও আদর্শের প্রসার ঘটাতে হলে মেলা খরচ। তবে, হ্যাঁ, পবিত্র পাথর দুটোও খুঁজছে ওরা...'

'তোমাদের আবার আদর্শও আছে? হাসালে দেখছি!'

'খবরদার! বিদ্রূপ করবে না!' গর্জে উঠল প্রধান পুরোহিত। 'আমাদের আদর্শ হলো, মানুষের ঘরে ঘরে শয়তানের উপাসনা প্রচলন করা, শয়তানের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা। কলিযুগ সাক্ষী, দুর্গা দেবী তথা মা কালীর প্রভাব আর কোন কাজে আসছে না। এখন চাই নতুন শক্তি। পুরানো কাপালি জাতি আর ঠগীরা নতুন শক্তিতে আবার উজ্জীবিত হয়ে...'

'এ-সব প্যাঁচাল তুমি বন্ধ করবে?'

'বিশ্বাস করছ না, আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছ না?' প্রধান পুরোহিত রানার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। 'কিন্তু বিশ্বাস তুমি অবশ্যই করবে, মিস্টার রানা। তুমি হবে সত্যিকার একজন বিশ্বাসী, অনুগত ও বিশ্বস্ত শয়তান উপাসক।' হাত নেড়ে সংকেত দিল সে।

গার্ডরা দ্রুত রানার গলায় লোহার একটা কলার পরিয়ে দিল, টেনে নিয়ে যাচ্ছে কুৎসিতদর্শন সাপের ফণা বিশিষ্ট মানুষের মূর্তির দিকে। ওটার সঙ্গে চেইন দিয়ে বাঁধা হলো ওকে, ফণার নিচে পিঠ ঠেকে আছে, ওর ঘাড় ও কব্জির চেইন মূর্তিটার পিছন দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বাঁধা বা আটকানো হলো কিছুর সঙ্গে।

রানা ভয় পাচ্ছে। উত্তপ্ত পরিবেশ, গাঢ় ছায়ার ভেতর পুরোহিত ও গার্ডদের আবছা নড়াচড়া, ম্যানিয়াক প্রধান পুরোহিতের আচরণ—যে-কোন কিছু ঘটে যেতে পারে।

দৈত্যাকার গার্ড রানার সামনে এসে দাঁড়াল। ভয় পাচ্ছে, এটা প্রকাশ করা চলবে না। রানা হাসল। 'শোনো তাহলে। আমি ষণ্ডাদের ঘৃণা করি।'

গার্ডও হাসল। মিথ্যে এরকম সাহসের ভাণ আগেও বহুবার দেখেছে সে।

দরজা খুলে গুহার ভেতর বালক মহারাজা ঢুকল। তার পিছনে রয়েছে অর্জুন রঙ্গনাথন। একে গিল্টি মিয়ার সেলে দেখেছে রানা। এখন অবশ্য তার চেহারায় ভয়ের ছাপ প্রায় নেই বললেই চলে। তার হাতে একটা মানুষের মাথার খুলি রয়েছে। খুলি, না কাটা মুণ্ডু?

মহারাজা পবনম বৈশাখমের দিকে তাকাল শুকদেব ধাওয়ান। 'মহামান্য মহারাজা বোধহয় চোরকে বিশ্বাসীতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়ায় সাহায্য করতে এসেছেন?'

মহারাজা চোখে-মুখে উদ্বেগ নিয়ে রানার সামনে দাঁড়াল। 'আপনার কোন কষ্ট বা পরিবর্তন হবে না। সম্প্রতি আমি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছি, এবং শয়তানের রক্তও পান করেছি।'

রানা আশ্বস্ত হতে পারল না। অর্জুন রঙ্গনাথনের হাত থেকে খুলিটা প্রধান পুরোহিতকে নিতে দেখল ও। ওটা একটা হাস্যরত খুলি, পোড়া চামড়া দিয়ে এখনও আচ্ছাদিত, নাক অর্ধেক পচে গেছে, চোখ প্রায় বের করে নেয়া হয়েছে, চামড়ার মত আড়ষ্ট জিভ বাঁকা হয়ে বেরিয়ে আছে। খুলি বা মুণ্ডুটা নিয়ে রানার সামনে চলে এলো শুকদেব ধাওয়ান।

দৈত্যাকার গার্ড রানার মুখ দু'হাতে চেপে ধরল, গায়ের জোরে ঠেলে মাথাটা ঠেকাল কদর্য মূর্তির গায়ে, তারপর চোয়ালে চাপ দিয়ে হাঁ করাল ওকে।

মুণ্ডুর জিভ থেকে রক্ত ঝরছে, সেই রক্ত রানার মুখে ঢালার জন্যে এগিয়ে এলো প্রধান পুরোহিত।

চেম্বারের অন্য এক প্রান্ত থেকে গিল্টি মিয়ার আর্তনাদ ভেসে এলো। 'স্যর, ওটা গিলবেন না! কিছুতেই না! উগরে দেন!'

রানা আসলে ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। ভেবেছিল শারীরিক নির্যাতন করা হবে, কিংবা সম্মোহিত করাবার জন্যে ম্যাজিক-ট্যাজিক কিছু দেখানো হবে। ওর হাঁ করা মুখের ভেতর শুকদেব ধাওয়ান প্রায় অনায়াসেই উষ্ণ খানিকটা তাজা রক্ত ঢেলে দিতে সমর্থ হলো। তবে গিলল না, সবটুকুই প্রধান পুরোহিতের গায়ে ছিটিয়ে দিল রানা।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে গেল শুকদেব ধাওয়ান। তার সারা শরীর রক্তে ভিজে গেছে। ঠোঁট চাটল সে। তারপর হিন্দি ভাষায় বিড়বিড় করে মহারাজাকে কিছু বলল।

রাজকীয় পোশাকের ভেতর হাত চালিয়ে ছোট্ট একটা পুতুল বের করল পবনম বৈশাখম। প্যান্ট-শার্ট পরা পুতুল। যতই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য লাগুক, সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই—পুতুলটা অনেকখানি রানার মত দেখতে।

মহারাজা সেটা উঁচু করে রানাকে দেখাল। তারপর রানার গায়ে ছোঁয়াল সেটা, সারা শরীরে বুলাল। লোহার পাত্রের সামনে চলে এলো পবনম বৈশাখম। জ্বলন্ত কয়লা থেকে উঠে আসা শিখার ওপর বারবার ধরল পুতুলটা।

যতবার অগ্নিশিখার সংস্পর্শে এলো পুতুল, ততবার প্রবল যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো রানার। শরীরে আগুন লাগার অনুভূতি। মগজ যেন শিখায় পরিণত হয়েছে। চিৎকার শুরু করার পর আর থামতে পারছে না।

বস্-এর এই অবস্থা দেখে গিল্টি মিয়া স্রেফ পাগল হয়ে গেল। যা কখনও কেউ করেছে বলে মনে হয় না, ছুটে এসে তাই করে বসল সে—দড়াম করে এক লাথি মেরে বসল মহারাজার নিতম্বে। খুদে রাজা ধরাশায়ী হলো, হাত থেকে ছিটকে পড়ল পুতুল। রানার মাথা ঝুলে পড়ল বুকের ওপর।

গিল্টি মিয়া লাফ দিল দেয়ালে ঝোলানো একটা চাবুক লক্ষ্য করে, কিন্তু একজন গার্ডের ল্যাং খেয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। আদেশ দিল প্রধান পুরোহিত। গার্ডদের প্রধান চাবুকটা হাতে নিয়ে তৈরি হলো।

দু'এক মুহূর্তের জন্যে চেইন মুক্ত করা হলো রানাকে। এবার পাথুরে শয়তানের দিকে মুখ করে বাঁধা হলো ওকে।

শুকদেব ধাওয়ানের নির্দেশে রক্তাক্ত খুলির ভেতর আরও তাজা রক্ত দেখা গেল অর্জুন রঙ্গনাথনকে। প্রধান পুরোহিত মন্ত্র পাঠ শুরু করল। গোঙাতে গোঙাতে সিধে হলো গিল্টি মিয়া, ছুটে গিয়ে একজন গার্ডকে মারল। কয়েকজন পুরোহিত ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে ধরল তাকে। টেনে নিয়ে গিয়ে চেইন দিয়ে বেঁধে রাখল দেয়ালের সঙ্গে।

তারপর চাবুক কষা হলো। প্রথমে রানাকে–গিল্টি মিয়া দেখছে ফোঁপাচ্ছে, তার শরীরের ঝাঁকি খাওয়া দেখে যে কেউ বুঝবে ব্যথাটা যেন সে রানার মতই অনুভব করছে–বেশি তো কম নয়। এরপর তার নিজেরই পালা।

'ওকে ছুঁয়ো না, বেজন্মা কুত্তারা!' চোখে ঝাপসা দেখছে রানা, মাথা ঘুরছে, অসহায় আক্রোশে ফুঁসছে। 'ওর বদলে আমাকে মারো!'

গিল্টি মিয়ার মারটা ওরা রানাকেই মারল। ওহ্, সে কি মার! চোখের পানিতে গিল্টি মিয়ার বুক ভেসে যাচ্ছে।

'গোটা ভারতবর্ষের বিধর্মীদের জবাই করা হবে,' প্রধান পুরোহিত রানার মুখে তাজা রক্ত ঢালতে ঢালতে বলল। 'হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ-জৈন–এদের সবার ধর্ম বাতিল হয়ে যাচ্ছে। আসল ধর্ম শয়তানের উপাসনা। পার্থিব-অপার্থিব, সমস্ত শক্তির উৎস হলো শয়তান। তিনিই আমাদেরকে জাগতিক আরাম-আয়েশ যোগান দিয়ে আসছেন, তিনিই নরকগুলোকে স্বর্গে রূপান্তর করে অনন্তকাল বাঁচিয়ে রাখবেন আমাদের। সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন গোটা দুনিয়া শাসন করবে মহামহিম শয়তান। জয় শায়তানকি!'

টানেল ধরে হোঁচট খেতে খেতে ছুটছে শমি। কিভাবে ঘরে ফিরে এলো নিজেও বলতে পারবে না। গায়ে-মাথায় হাত ঝাপটা দিয়ে পোকা ও কেঁচোগুলো ঝরাল সে। মাথায় একটাই চিন্তা, প্রথমে নিজেকে বাঁচাতে হবে, তা না হলে রানা ও বড়ভাইকে বাঁচানো যাবে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটল সে। ধারণা করল ভোর হতে খুব বেশি আর দেরি নেই। খোলা উঠানে দাঁড়িয়ে 'হেলপ! হেলপ!' করে চিৎকার করেও কোন লাভ হলো না। কেউ সাড়া দিচ্ছে না। একটা করিডরে ঢুকে দেখল মহারাজা পবনম বৈশাখমের পূর্ব-পুরুষদের পেইন্টিং ঝোলানো রয়েছে দেয়ালে। করিডরের শেষ মাথায় একটা মুখ। হঠাৎ আঁতকে উঠল শমি। কোথায় মুখ? এটা তো একটা আয়না!

তবে মুখটাও বাস্তব। সেটা ওর পিছনে। আয়নার ওই মুখটাই প্রতিফলিত হয়েছে। বন করে ঘুরল শমি, আঘাত করার জন্যে ডান হাতটা তৈরি।

লোকটা প্রাইম মিনিস্টার রাজ মালহোত্রা। 'আশ্চর্য, আপনি! এভাবে কেউ পিছু নেয়? ভয়ে আমি মারাও যেতে পারতাম! সে যাক, শুনুন। আমার জরুরী সাহায্য দরকার। আমরা এমন একটা টানেল পেয়েছি...' প্রাইম মিনিস্টারের কাঁধ ধরে একটু হাঁপিয়ে নিল শমি।

ঠিক এই সময় বাঁক ঘুরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল মেজর অশোক মেহতাকে। ভব্যতা ও বিনয় দেখিয়ে শমির উদ্দেশে মাথা নোয়ালেন তিনি, তবে কথা বললেন রাজ মালহোত্রার সঙ্গে। 'মাসুদ রানা তাঁর রুমে নেই।' তারপর শমির দিকে ফিরলেন। 'মিস বেনেগাল, আমার ট্রুপস ভোরবেলা রওনা হচ্ছে। আপনি চাইলে আপনাকে আমরা দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি।'

শমির মুখ সাদা হয়ে গেল। 'না, এভাবে আপনি চলে যেতে পারেন না! ভয়ানক কিছু একটা ঘটে গেছে। তারা বড়ভাইকে তো ধরেইছে, আমার ধারণা রানাকে...'

'হোয়াট?' আকাশ থেকে পড়লেন মেজর মেহতা। 'এ-সব কি বলছেন আপনি!'

মাথা ঝাঁকাল শমি, উত্তেজিত। 'আমরা একটা টানেল পেয়েছি। ওটা দিয়ে প্রাসাদের নিচে, একটা মন্দিরে নামা যায়। প্লীজ, আমার সঙ্গে আসুন—আমি আপনাকে দেখাচ্ছি!'

পুরুষ দু'জন সন্দেহভরা দৃষ্টি বিনিময় করল। রাজ মালহোত্রা মাথা নেড়ে নিরুৎসাহিত করতে চাইল মেজরকে। কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে মেজরকে ধরে টানাটানি শুরু করে দিল শমি, তাঁকে নিজের রুমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

রাজ মালহোত্রা ওদের পিছু নিল। 'মিস্ বেনেগাল, আপনার আচরণে কাণ্ডজ্ঞানের অভাব রয়েছে।'

শমির দু'সারি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে। 'জলদি! আমার ভয় হচ্ছে তারা না ওদেরকে মেরে ফেলে। ওখানে আমরা রোমহর্ষক সব কাণ্ড দেখেছি। নরবলি! দুর্ভাগা এক লোককে ধরে আনা হলো, আরেক লোক তার বুকে হাত ঢুকিয়ে হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে বের করে আনল!' এক হাতে মুখ ঢাকল সে। চোখে আরও গভীর সন্দেহ নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল রাজ মালহোত্রা আর মেজর মেহতা।

'আরেক লোক? কে সে?' গভীর আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন মেজর মেহতা।

'পুরোহিত। তারা বড়ভাইকেও ধরে নিয়ে গেছে। রানা চলে গেছে। রানা কোথায় চলে গেছে আমি জানি না। সে এমন মানুষ নয় যে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে কোথাও লুকিয়ে থাকবে।'

'গোটা ব্যাপারটার মধ্যে আফিমের গন্ধ পাচ্ছি আমি,' সহাস্যে বলল রাজ মালহোত্রা। 'মিস বেনেগাল কি নেশাটা থাইল্যান্ডে থাকতেই ধরেন?'

'এটাও একটা রহস্য! আপনি জানলেন কিভাবে আমি থাইল্যান্ডে ছিলাম?' শমি চিৎকার শুরু করল। 'আমি জীবনে কখনও নেশা করিনি। বিশ্বাস হচ্ছে না তো, বেশ, নিজের চোখেই দেখবেন সব।' দু'জনকে নিয়ে নিজের রুমে ফিরে এলো সে। দেয়ালের গায়ে ফাঁকটা হাত তুলে দেখাল। 'এই দেখুন! এবার বিশ্বাস হলো?'

একটা ল্যাম্প তুলে নিয়ে ফাঁকটার কাছাকাছি ধরলেন মেজর মেহতা। এই সময় সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে ওই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো রানা, কোটের

কলার থেকে টোকা দিয়ে একটা তেলাপোকা সরাল। ক্ষীণ একটু হাসল
'এখানে হচ্ছেটা কি? লুকোচুরি খেলা?'

হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে ছুটল শমি। লোকলজ্জার তোয়াক্কা না
রানাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সে। 'ওহ্, রানা! ঈশ্বরকে এক কোটি ধন্য
তুমি পালিয়ে আসতে পেরেছ।' ভয় পেল, প্রবল স্বস্তিতে এখনি জ্ঞান
পারে। 'কি ঘটেছে বলো ওঁদেরকে। ওঁরা আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছে
না।'

'সব ঠিক আছে,' শমির চুলের ভেতর ঠোঁট গুঁজে দিয়ে ফিসফিস
রানা। 'তুমি এখন ভাল আছ।'

'ওঁরা ভাবছেন আমি নেশা করেছি, মাথা ঠিক মত কাজ করছে
ফোঁপাচ্ছে শমি। 'ওদের বলো, ড্রাগস আমি ছুঁয়েও দেখি না। রানা,
হেলপ মি।' সারারাতের রোমহর্ষক ঘটনা স্নায়ুর ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি
রানার বুকে মুখ গুঁজে কাঁদছে শমি।

সাটিনের চাদরে তাকে শুইয়ে দিল রানা, চুলগুলো সরিয়ে দিল মুখ থেকে
'এই মেয়ে! কি আশ্চর্য! আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আমারই মত সত্যিকার
একজন অ্যাডভেঞ্চারার!' শমির চোখের পানি রুমাল দিয়ে মুছে দিল ও।

রানার একটা হাত ধরে আছে শমি। 'কি?' ফিসফিস করল সে। রানা
এখানে, তার পাশে। আর কোন ভয় নেই। সে নিরাপদ।

'এখন তোমাকে ঘুমাতে হবে, লক্ষ্মীটি।'

'আমি দিল্লি যেতে চাই,' বিড়বিড় করল শমি, চোখ বুজল। বিছানা
অস্বাভাবিক নরম লাগছে। রানার কণ্ঠস্বর এত গভীর। ওর হাত···

'আমি তোমাকে দোষ দিই না,' বলল রানা। 'সেই নাইটলাইফ থেকে
একের পর এক এতসব বিপদের মধ্যে দিয়ে এসেছ···'

শমির কাছে গোটা ব্যাপারটা অলৌকিক, মিরাকল বলে মনে হচ্ছে। রানা
ওকে উদ্ধার করল। ওর নিরাপত্তা নিশ্চিত করল। ওহ্, আমি বড় ভাগ্যবতী
মেয়ে। বলা হয়নি, কিন্তু মনে মনে তো জানি–ভূ-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ
তো এই লোকই–মাসুদ রানা।

খাট ছেড়ে দাঁড়াল রানা। শমির ঘরের বাইরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন মেজর
মেহতা ও প্রাইম মিনিস্টার রাজ মালহোত্রা। করিডরে বেরিয়ে এসে দরজা
ঠেলে দিল রানা। ওরা তিনজন করিডরের শেষ মাথায় চলে এলো। ভোরের
প্রথম আলো পাহাড়ের মাথাগুলোকে ছুঁয়ে দিচ্ছে। নিচের উপত্যকায় মেজর
মেহতার সৈন্যদল ভ্যান ও জীপে চড়ে ফেরবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

খুব বড় করে শ্বাস নিয়ে তাজা বাতাসে বুক ভরল রানা। 'গুহা আর টানেলে
ক্রল করে জীবনের বেশ কিছু সময় কাটিয়েছি আমি,' বলে মাথা নাড়ল
'কাজেই শমির মত কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি আমার।'

মাথা ঝাঁকালেন মেজর মেহতা: ভাবটা এমন, এ-সব যে ঘটবে তা যেন
তিনি আগেই সন্দেহ করেছিলেন। 'তারমানে মিস বেনেগাল আতংকিত হয়ে

পড়েছিলেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'পোকামাকড় দেখার পর অজ্ঞান হয়ে গেল। আমি তাকে তার কামরায় বয়ে নিয়ে এলাম। ঘুমাচ্ছে দেখে চারদিকটা ভাল করে দেখবার জন্যে আবার আমি টানেলে ঢুকি।'

'আর ওই ঘুমের মধ্যেই,' রাজ মালহোত্রা বলল, 'দুঃস্বপ্নটা দেখেন উনি।'

প্রাইম মিনিস্টারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা, কথার সুরে দৃঢ় নিশ্চয়তা প্রকাশের ভঙ্গি, 'হ্যাঁ, দুঃস্বপ্ন তো অবশ্যই।'

'আহা, বেচারি!' প্রাইম মিনিস্টারকে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল মনে হলো।

উদীয়মান সূর্যের দিকে চোখ রেখে মেজর মেহতা জানতে চাইলেন, 'ওই টানেলে আপনি কি দেখলেন বলুন তো, মিস্টার রানা?'

রানাও ওই একই সূর্যটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তবে সেটা ওর জন্যে উঠছে অন্য এক জগতে। 'কিচ্ছু না,' জবাব দিল ও। 'একদম ফাঁকা। কোথাও পৌঁছানো যায় না। ওটা আসলে বহু বছর ধরে পরিত্যক্ত।'

অনেক নিচ থেকে একজন সার্জেন্ট চিৎকার করে মেজর মেহতার দৃষ্টি আকর্ষণ করল—রওনা হবার জন্যে তারা তৈরি।

'তো, প্রাইম মিনিস্টার,' আশ্বস্ত করার সুরে মেজর বললেন, 'আমার রিপোর্টে এ-কথা পরিষ্কারভাবেই লেখা থাকবে যে চৌপলে অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায়নি।'

মেজরের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাথা নত করল প্রাইম মিনিস্টার। 'আমি নিশ্চিত, এ-কথা শুনে মহামান্য মহারাজা ভারী খুশি হবেন।'

শেষবারের জন্যে রানার দিকে ফিরলেন মেজর মেহতা। 'আগেও যেমন আপনাদের বলেছি, ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে একই প্লেনে দিল্লি পর্যন্ত যেতে পারেন। আমার ট্রুপস সোনাই রূপাই শহরে থাকবে, কিন্তু পাওনা ছুটি নিয়ে আমি দিল্লি যাচ্ছি।'

সবিনয়ে হাসল রানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু না, অত দূরের পথ পাড়ি দিতে হলে শমিকে আগে পুরোপুরি সুস্থ হতে হবে।'

খানিক পরই চৌপল প্রাসাদ ত্যাগ করে সৈন্যদের নিয়ে চলে গেলেন মেজর মেহতা।

শমির ঘুম ভাঙল কি একটা অদ্ভুত শব্দে। শব্দটা স্বপ্নের ভেতর শুনেছে কিনা ঠিক বুঝতে পারল না। মশারির বাইরে চোখ পড়তে ঘরের দরজা খোলা দেখল সে। অন্তত ঘরের অন্ধকার এখনও পুরোপুরি কাটেনি, তবে রানাকে দেখে চিনতে পারল—পা টিপে ঘরে ঢুকছে।

শমি ঠোঁট টিপে হাসল। অবশেষে! অবশেষে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে। রানা আসছে তার কাছে।

রানা তোশকের ওপর বসতে শমি একটু নড়েচড়ে শুলো। বসার পর রানা কিন্তু আর নড়ছে না—শমির দিকে পিঠ, কাঁধ দুটোয় ঝুলে পড়া ভাব। আহা বেচারি, নিশ্চয় খুব ক্লান্তি বোধ করছে।

মশারির ফিনফিনে কাপড়ের ভেতর দিয়ে রানার মাথায় হাত বুলাল শমি।

'রানা? তুমি ওঁদের সঙ্গে কথা বলেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে এখন ওঁরা আমার কথা বিশ্বাস করবেন,' শূন্যস্থান পূরণ করে শমি।

'হ্যাঁ, তোমার কথা ওরা বিশ্বাস করেছেন।'

শমি ভাবল, রানার কণ্ঠস্বর কেমন যেন আড়ষ্ট ও একঘেয়ে, যেন মুখস্থ করা জবাব আওড়াচ্ছে। 'মেজর মেহতা নিশ্চয়ই ওই মন্দিরে সৈন্য পাঠাবেন, তাই না?' জিজ্ঞেস করল সে।

রানা কিছু বলছে না। শমি ভাবল, এখানে এভাবে বসে রানা ঘুমিয়ে পড়তে পারে না। তবে সেরকম কিছু ঘটলেও আশ্চর্য হবে না সে। যে ধকল সইতে হয়েছে ওকে! 'কাল রাতে আমি যে আতংকে মারা যাইনি, এটাই আশ্চর্য!' বলল সে। 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।'

'না, মারবে কেন। মারবে না।'

রানার পিঠে হাত রাখল শমি। মশারির কাপড় ও শার্ট থাকা সত্ত্বেও পিঠে ভেজা ভেজা লাগল। মিষ্টি হাসি ফুটল তার ঠোঁটে, কৃত্রিম তিরস্কারের সুরে বলল, 'একটা সত্যি কথা বললে রাগ করবে না তো? তোমার সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়ার পর থেকে একের পর এক শুধু বিপদই ঘটছে। তুমি একটা কুফা! তবে সত্যি যদি তোমাকে হারিয়ে ফেলতাম, আমাকে বোধহয় বাঁচানো যেত না।'

ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল রানা। 'তুমি আমাকে হারাবে না, শমি।'

শমি তার হাতটা ঝট করে টেনে নিল। আঙুলগুলো তাজা লাল রক্তে ভিজে গেছে।

রানার মুখ নেমে এলো। ওর চোখ দুটো সরাসরি শমির চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। দু'জনের মাঝখানে এখনও মশারি রয়েছে, তাসত্ত্বেও রানার চোখের পরিবর্তন শমির দৃষ্টি এড়াল না।

রানার চোখ সাদা ও কালো ছিল, এখন ঝাপসা লাল আর ঘোলা বাদামী হয়ে গেছে। এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তন হিম আতংক ছড়িয়ে দিল শমির সারা শরীরে।

উপলব্ধি করল, রানাকে সত্যি হারিয়ে ফেলেছে সে।

গোপন পাতালে এই মন্দির কাপালি আর ঠগীদের কাছে 'জন্ম-মৃত্যুর ঠাঁই' নামে পরিচিত। ভয়ালদর্শন কিছু মুখের অধিকারী শয়তান উপাসকরা বাতাসের বিলাপ ধ্বনির সঙ্গে যেন তাল বজায় রেখে দুলছে। বলিদানের অনুষঙ্গ হিসেবে ধীরলয়ে সুর করে মন্ত্রপাঠ চলছে। সময়টা সবেমাত্র সকাল।

পূজারীদের মধ্যে মহারাজাও রয়েছে। ফাটলটার কাছে সামান্য উঁচু একটা প্ল্যাটফর্মে বসে আছে সে, অগ্নিময় গহ্বরের অপরদিকে, দৃষ্টি শয়তানের মূর্তির ওপর নিবদ্ধ।

'জ্যয় শায়তানকি! জ্যয় শায়তানকি!'

আবারও সাপ ও মানুষ আকৃতির মূর্তির সামনে কৈলাস পর্বতে শিব-এর

কাছ থেকে পাওয়া পাথর তিনটে নিজস্ব আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বেদিটাকে ঘিরে মোচড় খাচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো প্রধান পুরোহিত শুকদেব ধাওয়ান; সে-ও গুনগুন করে মন্ত্র পড়ছে।

'জ্যয় বাবা শায়তান! জ্যয় বাবা শায়তান!'

নারী উপাসিকারা এলো পাশের গুহাগুলো থেকে, লাল শাড়িতে অগ্নিশিখার মতই লকলকে। ধ্যানমগ্ন ও মন্ত্রমুগ্ধ পুরোহিতদের সামনে দিয়ে নিঃশব্দ চরণে এগোল তারা, প্রত্যেকের কপালে এঁকে দিল রক্তবর্ণ তিনটে করে মোটা রেখা। তারপরই প্রধান পুরোহিত সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ দিতে শুরু করল।

রাজ মালহোত্রা সুট ছেড়ে লাল আলখেল্লা পরেছে, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানার পাশে। একজন উপাসিকা এগিয়ে এসে মালহোত্রার কপালে তিলকের কয়েকটা ফোঁটা এঁকে দিল। রানা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গহ্বরের তরল শিখায়, চোখে শূন্য দৃষ্টি। ও এখন একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর বাস করছে। চোখের সামনে তরল শিখাগুলোকে পাক ও মোচড় খেতে দেখতে পাচ্ছে, হঠাৎ সেগুলো পাখি হয়ে ছুটোছুটি শুরু করল রোস্ট হবার ভাল কোন জায়গার সন্ধানে। একে একে সবগুলোকে নিজের মাথার ভেতর গ্রহণ করছে রানা।

মাথার ভেতর এখন কোন বস্তু নেই—ওটা স্রেফ বিশাল এক গুহা, ফলে পাখিগুলো কোথাও নামতে পারছে না, ওর খুলির ভেতর শুধু ডানা ঝাপটাচ্ছে। তারপর শুরু হলো ডাকিনী শমির সুদিন। রানার খুলির ভেতর একটা একটা করে ধরে পাখিগুলোকে কচমচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলছে।

প্রধান পুরোহিত শুকদেব ধাওয়ানের ভাষণ শেষ হলো। রানা এখনও তরল শিখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। রাজ মালহোত্রা ভাষণটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনাল ওকে। 'প্রধান পুরোহিত বিশ্বাসীদের বলছেন, বিজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। বলছেন, সৈন্যদের চলে যাওয়াটা শয়তানের নতুন ক্ষমতা প্রমাণ করে।'

মাথা ঝাঁকাল যেন সম্মোহিত একজন রানা। 'হ্যাঁ, আমি উপলব্ধি করছি।' পুরোহিতদের মন্ত্রপাঠের সঙ্গে তাল বজায় রেখে দুলছে ও, পাশে বসিয়ে রাখা ছোট একটা পুতুল ওকে অনুপ্রাণিত করছে বলে মনে হলো।

মন্দিরের নিচে, খনির অন্ধকার দিকটায়, রক্তাক্ত আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে শিশু-কিশোররা। যারা ক্লান্ত বা অসুস্থ, মোটাসোটা গার্ডরা তাদেরকে হয় বুট দিয়ে লাথি মারছে, নয়তো চাবুকপেটা করছে। মাঝে-মধ্যে মাটির দেয়াল কাত হয়ে ধসে পড়ে, তখন বাচ্চাদের অনেকেরই জ্যান্ত কবর হয়ে যায়।

গিল্টি মিয়া রোগা লিকলিকে, যেন একটা বাচ্চাই, তাই শেকল দিয়ে বেঁধে এনে এখানে কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সবার সঙ্গে সেও মাটি খুঁড়ে পাথর সরাচ্ছে। খুঁজছে শিব-এর কাছ থেকে বর হিসেবে পাওয়া শেষ দুটো পবিত্র রত্ন।

গিল্টি মিয়ার সঙ্গে পাঁচজন শিশুকে দেয়া হলো, তাদের কাজ মাটি খুঁড়ে নতুন একটা টানেল তৈরি করা। ঘণ্টা তিনেক পর বড় একটা পাথর ওদের

সামনে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়াল। গিল্টি মিয়ার বুদ্ধিতে হাতুড়ি আর শাবল নিয়ে আসা হলো। শাবল চালাল সে একাই, বাকিরা হাতুড়ির বাড়ি মারল পাথরটার গায়ে। এভাবে আধ ঘণ্টা চেষ্টা করার পর বাধাটাকে টুকরো টুকরো করা সম্ভব হলো।

টুকরোগুলো সরানো হচ্ছে, হঠাৎ নিজের অজান্তেই গিল্টি মিয়ার গলা চিরে একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো।

ওরা একটা গলিত লাভার শিরা বের করে ফেলেছে। যথেষ্ট পুরু, ফলে প্রায় নড়ছেই না, উত্ত্যক্ত কেউটের মত হিসহিস করছে কেবল।

ওদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে একজন গার্ড ছুটে এলো। অকারণে প্রথমেই সবাইকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে নিল সে। তারপর তার নজর পড়ল সদ্য খুঁড়ে বের করা লালচে শিরাটার দিকে।

অকস্মাৎ পুরু লাভায় একটা বুদ্বুদ সৃষ্টি হলো। বুদ্বুদটা ফেটেও গেল তখনি টকটকে লাল খানিকটা তরল পাথর পড়ল গার্ডের পায়ে। পরনে ধুতি, হাঁটু আর জুতোর মাঝখানে তার পা নগ্ন। ওই নগ্ন পায়ে তরল লাভা যেন লেপ্টে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল মাংস পোড়া গন্ধ। বিকট এক আর্তনাদ ছেড়ে বসে পড়ল সে, হাত দিয়ে ঘষে চামড়া থেকে তরল লাভা সরাবার চেষ্টা করল।

ছেলেরা তাকিয়ে রয়েছে। এই সময় অত্যাশ্চর্য একটা ব্যাপার ঘটল। গার্ডের চেহারায় সত্যি সত্যি স্বস্তি ও আরামের ভাব ফুটল, মুখের কঠিন রেখাগুলো হয়ে উঠল নরম। তার দৃষ্টিতে একটু আগে যে ক্রোধ আর আক্রোশ ছিল, এখন তা নেই, তার বদলে সম্পূর্ণ শান্ত ও কোমল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। কি যেন ভাবছে, কি যেন মনে পড়ছে তার।

চিৎকার ও গোঙানি বন্ধ করল সে, তাকাল গিল্টি মিয়ার দিকে। লোকটাকে কৃতজ্ঞ মনে হচ্ছে। এখনি যেন কেঁদে ফেলবে। তার হাবভাব অনেকটা এরকম–হঠাৎ উপলব্ধি করতে পেরেছে এইমাত্র একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জাগল সে। গিল্টি মিয়ার হাত ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করল–প্রথমে হিন্দিতে, তারপর ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে।

হঠাৎ অন্যান্য গার্ডরা এসে পড়ল। ধরাশায়ী সঙ্গীকে ধরল তারা, টেনে-হিঁচড়ে টানেলের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটা তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। সেই সঙ্গে চেষ্টা করছে জেগে থাকতে।

সে শয়তানের দেখানো দুঃস্বপ্নে ফিরে যেতে চায় না।

'বুজেচি! বুজেচি!' আপনমনে বিড়বিড় করছে গিল্টি মিয়া। 'এই আগুনই সব। আগুনটাই একে জাগিয়ে দিয়েচে। আমি তো দেকচি সারকেও তাহালে...'

গার্ডরা সবাই টানেল থেকে বেরিয়ে গেছে, এই সুযোগে শাবলটা তুলে নিয়ে লোহার মোটা শেকলের ওপর একের পর এক আঘাত করতে শুরু করল গিল্টি মিয়া। সারকে মায়ার জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনতে হলে নিজেকে তার মুক্ত করতে হবে।

প্রাইম মিনিস্টার রাজ মালহোত্রা এখনও রানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'আপনি

ঠিক বুঝতে পারছেন, প্রধান পুরোহিত কি বলছেন আমাদেরকে?' দীক্ষা পাওয়া নতুন শিষ্যকে জিজ্ঞেস করল সে।

যেন একটা যন্ত্রচালিত পুতুল, মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল রানা, 'মহামহিম শয়তান আমাদের ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। আমরা শয়তানের সন্তান। আমরা তাঁর জয়কীর্তন করব। মাংস ও রক্ত দিয়ে পুজো করব কেবল তাঁকেই।'

রাজ মালহোত্রাকে সন্তুষ্ট মনে হলো। তার ছাত্র দ্রুত উন্নতি করছে।

তবে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার মালহোত্রাকে বিরক্ত করে তুলল। বাষ্প আর ধোঁয়ায় ঢাকা ছায়ার দিক থেকে ভেসে আসছে।

কোন আবেগ নেই, শমিকে নিয়ে আসাটা চাক্ষুষ করছে রানা নির্বিকার চিত্তে। এখন তার পরনে লাল-নীল সিল্কের সালোয়ার-কামিজ, গলায় দোপাট্টা, পায়ে সোনালি স্যান্ডেল। নতুন এক সেট গহনাও পরানো হয়েছে।

দু'জন তাগড়া পুরোহিত শক্ত করে ধরে আছে তাকে। শমি ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, সেই সঙ্গে চিৎকার করছে সারাক্ষণ, পুরোহিতদের গায়ে থুথু ছিটাচ্ছে। বেচারি জানে কেন এখানে ধরে আনা হয়েছে তাকে। এখন কি করা হবে।

তার দিকে ইঙ্গিত করে মালহোত্রা রানাকে বলল, 'আপনার বান্ধবী দেখে ফেলেছেন। আপনার বান্ধবী শুনে ফেলেছেন। কাজেই তাঁর মুখ বন্ধ হওয়া দরকার।'

অর্ধ-সাপ অর্ধ-মানব মূর্তিটার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শমিকে, এই সময় রানাকে দেখতে পেল সে। 'রানা! হেলপ্ মি! ভগবানের দোহাই, তোমার হয়েছেটা কি?'

যেন একটা হাবাগোবা, হাঁ করে শমিকে হাতকড়া পরাতে দেখছে রানা। তবে হাতকড়ার চেইন আটকানো হলো লোহার ফ্রেমের সঙ্গে, যে ফ্রেমটা মূর্তির একটা হাত থেকে মেঝের কাছাকাছি ঝুলছে।

নিজের পায়ের দিকে তাকাল রানা। সামনে দিয়ে বিরাট একটা জাত গোক্ষুর যাচ্ছে অন্ধকার কোন জায়গার খোঁজে। ঝুঁকে ওটাকে তুলল রানা, মাথায় আদর করে হাত বুলাল—ওরা এখন একই জগতের প্রাণী। সাপটাকে বুকে জড়াল ও—ওটার স্বজনের কাছাকাছি, যে ওখানে ঘুমাচ্ছে। অনেকক্ষণ জড়িয়ে রাখল, শমি যাতে ওকে ওর পারিবারিক সদস্যদের সঙ্গে দেখতে পায়।

এসব কি ঘটছে, শমি বিশ্বাস করতে পারছে না। 'রানা!' মিনতি করল সে। 'আমাকে নিয়ে ওদেরকে তুমি এটা করতে দিয়ো না! দিয়ো না করতে!' কিন্তু তাকে রক্ষার জন্যে একটা পেশীও রানা নাড়ল না। সে গোক্ষুর সাপটাকে আদর করতে ব্যস্ত।

শমি খুন হতে যাচ্ছে।

নৃশংসভাবে হত্যা করা হবে তাকে। কষ্ট দিয়ে।

শমির আর বুঝতে বাকি নেই যে যেভাবেই হোক রানাকে ওরা নিজেদের মুঠোয় ভরে ফেলেছে। কিন্তু কিভাবে তা পারল?

ম্যাজিক? জাদু?

ম্যাজিক হোক বা জাদু, শমির তাতে কিছু আসে যায় না। সে শুধু জানে সাহায্য না এলে তাকে মেরে ফেলা হবে। অথচ কেন মেরে ফেলা হবে তা জানে না। রানার সাহায্য পাওয়া যাবে না, সেজন্যে ওকে সে দায়ী করছে না। না, রানা তোমার ওপর আমার কোন রাগ নেই। আমি জানি তুমি তোমার মধ্যে নেই

পুরোহিতরা শমির গোড়ালি লোহার ফ্রেমের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধছে 'এই হনুমান! এই বাঁদর!' চিৎকার জুড়ে দিল সে। 'ব্যথা দিচ্ছিস কেন? ঠোঁটের কোণে ফেনা জমে যাচ্ছে। 'যা করার আস্তে-ধীরে করতে পারিস না? একজন অসহায় মহিলার ওপর নির্যাতন করতে তোদের লজ্জা করছে না? এতেও যখন কোন কাজ হচ্ছে না, তখন আরও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, 'রানা!'

ফ্রেমে আটকানো হলো শমিকে। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল সে। ফ্রেমটা ঝুলছে। শুকদেব ধাওয়ান ফ্রেমটাকে ঘিরে ঘুরছে। রানা শমির দিক থেকে চোখ সরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। সাপটাকে মেঝেতে সযত্নে নামিয়ে দিল। বুকে হেঁটে এক কোণে চলে গেল ওটা।

একজন পুরোহিত টান দিয়ে শমির নেকলেসটা ছিঁড়ে নিল।

'এই কুকুরটার স্পর্ধা তো কম নয়!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল শমি 'গহনা এমন জিনিস যে...'

তার সামনে চলে এলো প্রধান পুরোহিত। শমির একগুঁয়েমি ভাব দেখে সে খুশি। সামান্য একটু মাথা নত করল সে, তারপর একটা হাত উঁচু করল-শমির হৃৎপিণ্ডের দিকে।

ধাওয়ানের হাত বুকের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে শমি বরফ হয়ে গেল। এই পর্বটা আগে একবার দেখেছে সে। এবার অভিশাপটা তার নিজের ওপর নেমে আসায় ইচ্ছে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। শেকল দিয়ে বাঁধা না থাকলে এতক্ষণে মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ে যেত সে। হাঁটু দুটো নরম কাদা হয়ে গেছে জাদুকরের হাত এখনও উঠছে। উঠছে ওর বুক লক্ষ্য করে। এই শমি, কিছু একটা কর না! তোর না এত বুদ্ধি! 'থামো!' তীক্ষ্ণ বাঁশী বাজল যেন শমির গলায়। 'এখনি নয়। প্লীজ। তোমরা যা বলবে আমি তাই করব। বিশ্বাস করো, দিল্লির অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক আর শিল্পপতিকে আমি চিনি। থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবলের সামনে নাচার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আমি মুম্বাই মাফিয়ার কুদ্দুস মোল্লা, সাব্বির খান আর নাসির আব্বাসের হয়ে যারা কাজ করে তাদের অনেককে চিনি।'

ওর কোনও কথায় কান দিল না পুরোহিত। সে তার হাত শমির বুকের আরও কাছাকাছি তুলল। বুকের ওপর কাপড়ে তার ঠাণ্ডা হিম আঙুলের ছোঁয়া অনুভব করল শমি। অসুস্থকর একটা চাপ বাড়ছে, যেন একটা সাপ ঢোকানো হচ্ছে ওর গলায়, কিংবা চোখের ভেতর গরম সিক।

শমি জ্ঞান হারাল।

নিজের চেষ্টায়, একা, শাবল দিয়ে ঘা মেরে মেরে লোহার শেকল কেটে ফেলল

গিল্টি মিয়া। টানেলে ওর সঙ্গী পাঁচটা বাচ্চা এত দুর্বল, এত ভীরু, ওকে কোন সাহায্যই করল না। গিল্টি মিয়াও ওদেরকে কোন সাহায্য করার সুযোগ পেল না। নিজেকে মাত্র মুক্ত করেছে, একজন গার্ড উঁকি দিয়ে তাকাল। 'এই, এখানে তোমাদের কোন কাজ নেই। আমার সঙ্গে অন্য টানেলে চলো।'

তার পিছু নিয়ে রওনা হলো সবাই। রেল লাইন দিয়ে খনির কার ছুটতে দেখল গিল্টি মিয়া। গার্ড ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে নেই, কাজেই লাফ দিয়ে একটা চলন্ত কারে চড়ে বসতে কে তাকে বাধা দেয়! ওর সঙ্গীরা ওকে পালাতে দেখছে, তবে কেউ কিছু বলছে না। গিল্টি মিয়ার সংকেত তারা বুঝতে পেরেছে—ওদেরকে মুক্ত করার জন্যে ফিরে আসবে সে।

জ্ঞান ফেরার পর শমি দেখল ত্রস্তপদে মন্দির থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে প্রধান পুরোহিত শুকদেব ধাওয়ান। লোকটা তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নেয়নি—তাকে নিয়ে স্রেফ খেলছিল! বুকে অপ্রত্যাশিত আশা জাগতে চোখ দুটো তার জলে ভরে উঠল।

মরিয়া হয়ে কব্জির বাঁধন খোলার চেষ্টা করল শমি। এবং কী আশ্চর্য! ঘামে হাত দুটো পিচ্ছিল হয়ে থাকায়—হাতকড়ার তুলনায় তার হাত দুটো সরুও বটে—পাঁচ মিনিটের চেষ্টাতেই নিজেকে মুক্ত করে ফেলল সে। মুক্ত একটা হাত করুণ আবেদনের ভঙ্গিতে রানার দিকে বাড়াল। 'রানা, আমাদের সাহায্য করো! ভগবানের দোহাই লাগে, তুমি জাগো! প্লীজ! প্লীজ, ফিরে এসো আমার কাছে! তোমার মনে পড়ছে না—আমি তোমার?'

শমির খাঁচার দিকে এগিয়ে এলো রানা। ধীরে ধীরে তার হাতটা ছুঁলো। শমি রানার আঙুলগুলো শক্ত করে ধরে রাখল। নিজের ঠোঁটের কাছে তুলে শমির হাতে চুমো খেলো রানা। দু'জনে ওরা পরস্পরের চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। হ্যাঁ, উত্তেজিত শমি ভাবল, ফিরে আসছে! রানা আমার কাছে ফিরে আসছে!

কিন্তু শমিকে কিছু বুঝতে না দিয়ে তার হাত দুটোয় আবার হাতকড়া পরিয়ে তালা টিপে দিল রানা, তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে দিল। দূরে দাঁড়িয়ে সবই দেখল শুকদেব ধাওয়ান। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল।

পুরোহিতরা আবার একযোগে মন্ত্র আওড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গে এবার রানাকেও ঠোঁট মেলাতে দেখা গেল।

খাঁচায় বন্দী শমিকে এবার গহ্বরের ভেতর নামানো হচ্ছে। নিচের দিকে তাকিয়ে তরল লাভা টগবগ করে ফুটতে দেখল সে।

দশ

এই টানেল সেই টানেল ধরে পালাবার সময় এক জায়গায় রানার ব্যাগটা দেখতে পেয়ে তুলে নিয়েছে গিল্টি মিয়া। গার্ডদের ধাওয়া খেয়ে হাঁপিয়ে গেলেও কোথাও বসে বিশ্রাম নেয়ার কথা ভুলেও ভাবছে না সে। ছুটতে ছুটতে কাঠের লম্বা মইটা চোখে পড়ল। উঠে গেছে দীর্ঘ একটা কারনিসে। পাথরের দেয়াল ভেঙে তৈরি করা হয়েছে অসংখ্য টানেলের মুখ, ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে গেছে মইটা। তরতর [illegible] বিশ ফুট উঠে এলো গিল্টি মিয়া, এই সময় খেয়াল করল দু'তিনজন গার্ড ওর পিছু নিয়েছে।

গিল্টি মিয়া দেখল আরও খানিক ওপরে একটা ঝুল-পাথর রয়েছে, ওটা থেকে ঝুলছে মোটা একটা রশি। কিন্তু মইয়ের মাথা যেখানে ঠেকেছে সেখান থেকে রশিটার দূরত্ব সাত ফুটের কম নয়।

নিচে তাকিয়ে ঘাবড়ে গেল গিল্টি মিয়া। মই বেয়ে উঠতে শুরু করছে গার্ডরা। বাঁচার আর কোন উপায় নেই দেখে পাগলের মত আচরণ শুরু করল—মইটা ধরে ঘন ঘন ঝাঁকাচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্তরের টানেলে বস্তা কাঁধে ভিড় করেছে অনেক শিশু-কিশোর। তারা দেখল গিল্টি মিয়া আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। মই থেকে গার্ডরা পড়ছে না, গিল্টি মিয়া নিজেও পড়েছে না, তবে ওদের সবাইকে নিয়ে মইটা একদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে।

মই পড়ে যাচ্ছে। গিল্টি মিয়া সম[illegible] থাকতেই লাফটা দিল। হালকা শরীর, বলা যায় ব্যাঙের মত উড়ল কিছুটা। [illegible]লম্ব রশিটা খপ করে ধরে ফেলল সে, ওটা বেয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঝুল-পাথরের ওপরে উঠে গেল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল সিলিঙে তৈরি ফাঁকটার ভেতর।

ফাঁক দিয়ে ভেতরে গলে দেখল এটা কামরা। এখানে কেউ নেই, তবে দরজার বাইরে থেকে বহু লোকের সম্মিলিত মন্ত্রপাঠের গমগমে গুঞ্জন ভেসে আসছে। দরজার কবাট সামান্য একটু ফাঁক করল গিল্টি মিয়া। অর্ধ-মানব ও অর্ধ-সর্প আকৃতির কালো লম্বা পাথুরে মূর্তিটার চারপাশে আলোর উজ্জ্বলতা লক্ষ করল সে। বেদির পিছনে এটা হলো 'জীবন-মৃত্যুর ঠাঁই'।

বেদির আড়াল থেকে বিশাল গুহার ভেতর মন্দিরে চোখ বুলাল গিল্টি মিয়া, ঠিক যে সময় খাঁচায় বন্দিনী শমিকে গহ্বরের নিচে নামানো হচ্ছে। ওখানে, গহ্বরের কিনারায়, দাঁড়িয়ে রয়েছে তার প্রাণপ্রিয় সার—মাসুদ রানা। শমির অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা নির্বিকার চিত্তে উপভোগ করছে।

নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফিসফিস করল গিল্টি মিয়া। 'এ আমার চোকের ভুল। যা ঘটচে না আমি তাই দেকচি।' কিন্তু নিজেকে চিমটি কাটা ও চোখ রগড়াবার পরও যখন দৃশ্যটা বদলাল না, তখন সে ভাবল, 'অবিশ্বাস করচি কেন? এরকম যে ঘটবে তা তো আমার ধরে নোয়াই উচিত ছিল।'

রানার উদ্দেশে হাত নাড়ল গিল্টি মিয়া। তবে রানা নয়, তাকে খপরে দেখতে পেল রাজ মালহোত্রা। লাইম মিনিস্টার চিৎকার করে দু'জন গার্ডকে নির্দেশ দিল, 'উ শালেকো পাকড়ো!' কিন্তু গিল্টি মিয়া ধাওয়া খেয়ে বাউন্ড কাটায় ওস্তাদ, তার পায়ে চিতার শিকারী-গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে রানার সামনে পৌঁছে যাচ্ছে সে।

তবে পুরোহিতদের একজন নাগাল পেয়ে খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলল। কোন কথা নয়, লোকটার হাত ঝামড়ে দিল গিল্টি মিয়া, জানে জান বাঁচানোর লড়াইয়ে সব চলে। পুরোহিত ফুঁপিয়ে উঠে ছেড়ে দিল তাকে। আরেক পুরোহিত বাধা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। তাকে ঘুসি মারার জন্যে লক্ষ্যস্থির করল, কিন্তু সেখানে মারল না, হাঁটুর নিচে শক্ত হাড়ে জুতোর ডগা দিয়ে প্রচণ্ড মারল। পরমুহূর্তে রানার সামনে পৌঁছে গেল সে হাসিমুখে। 'এয়োচ, সার। জাগুন দেকি, জাগুন!' মূর্তির দিকে তাকিয়ে চুটকি বাজাল। 'ছু মন্তর ছু, জাদুবিদ্যা কু; ঈশ্বর ভগবান আল্লাহ সত্যি, তোদের শয়তানের মুখে মুতি!'

জবাবে ঠাস করে চড় মারল রানা গিল্টি মিয়ার গালে। ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল সে, সুতি ক্যাপটা খসে পড়ল মাথা থেকে। ছলছল চোখে সে শুধু বলতে পারল, 'জাগুন, সার!' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

দৃষ্টিতে অনুমোদন নিয়ে গোটা দৃশ্যটা দেখল রাজ মালহোত্রা। রানা ট্যুরিস্ট বলে নিজের পরিচয় দিলেও, রানাকে ঠিকই চিনতে পেরেছে সে। বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক থাকায় বাংলাদেশী ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে অনেক খবরই রাখতে হয় তাকে, আর সেই সূত্রে জানা আছে এই মাসুদ রানা আসলে বিসিআই-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন এজেন্ট। একে অচল অকেজো করে দিতে পারলে বিভিন্ন মহল থেকে পুরস্কার, সহায়তা ও প্রশংসা পাওয়া যাবে। আর নিজেদের কাজে-ব্যবহার করতে পারলে তো কথাই নেই। বিশ্ব বিখ্যাত এসপিওনাজ এজেন্ট মাসুদ রানা সত্যিকার অর্থে ধর্ম পরিবর্তন করে একজন নিবেদিতপ্রাণ শয়তান উপাসকে পরিণত হয়েছে। তার ক্যারিয়ার ধ্বংস করার জন্যে আর কিছুর কি দরকার আছে?

ওদিকে শমিকে নিয়ে লোহার খাঁচাটা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে গহ্বরের ভেতর। আগুনের আঁচ অসহ্য গরম। গলার ভেতরটা আর ফুসফুস পুড়ে যাবে, এই ভয়ে দম আটকে রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো সে। তার মুখের চামড়া কি এরই মধ্যে গলতে শুরু করেছে? চোখ পুড়ছে? চামড়ায় আগুন ধরে গেছে? 'এই বোকা!' হঠাৎ অসহায় ক্রোধে চিৎকার করে উঠল শমি রানার উদ্দেশে। 'দেখতে পাচ্ছ না, আমি তো মারা যাচ্ছি!'

রানার কোন সাড়া নেই। সে নির্বিকার।

গার্ডরা আবার ধাওয়া করায় ছুটে একটা দেয়ালের কাছে চলে এলো গিল্টি মিয়া। ব্রাকেট থেকে জ্বলন্ত একটা মশাল নামিয়ে তলোয়ারের মত বাগিয়ে ধরল সামনে, গার্ডদের গায়ে আগুন ধরাবার হুমকি দিচ্ছে। তারা পিছু হটতেই জল্লাদের দিকে ছুটল সে। এই জল্লাদ হুইল ঘোরাচ্ছে বলেই শমিকে নিয়ে তরল পাভা ভর্তি গহ্বরে নেমে যাচ্ছে লোহার বাস্কেট বা খাঁচাটা।

জ্বলন্ত মশালের ভয়ে হুইল ছেড়ে না পালিয়ে উপায় থাকল না [illegible] 'আদমি তো ছোটা হ্যায়,' হিন্দিতে বলল সে, 'মাগার মুসিবত বহুত বড়া [illegible] হোতা!' সে হুইল ত্যাগ করায় শমি এখন আর নিচে নামছে না। মুখের [illegible] ঝুলে আছে।

'পাকড়ো উসকো! মার ডালো!' হুংকার ছাড়ল শুকদেব ধাওয়ান, হিংস্র আক্রোশে পিশাচের মত দেখাচ্ছে তাকে।

আরও দু'জন গার্ড ধাওয়া করল গিল্টি মিয়াকে। গিল্টি মিয়া আবার সোজা রানার দিকে ছুটল।

'ও সার, পিলিজ, জাগুন!' আকুল হয়ে চেঁচাল গিল্টি মিয়া। কিন্তু কোন সাড়া পেল না। একেবারে শেষ মুহূর্তে দু'জন গার্ডের দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। এই দু'জন এখনি তাকে ধরে ফেলবে। ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন থেকে গিল্টি মিয়ার গলাটা হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল রানা। দম আটকে মেরে ফেলছে।

গিল্টি মিয়াকে শূন্যে তুলে ফেলল রানা। গিল্টি মিয়া ঘুরে গেছে পরস্পরের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে ওরা। দম ফেলতে পারছে না তারপরও বহু কষ্টে গিল্টি মিয়া বলল, 'সার, আপনাকে কিন্তু আমি বিনা স্বার্থে ভালবেসেছিলুম!' বলেই মশালটা রানার পাঁজরে ছোঁয়াল সে।

ঢলে পড়ল রানা। আগুন ওর মাংস সেদ্ধ করছে। চেঁচিয়ে উঠে গিল্টি মিয়াকে ছেড়ে দিল ও।

মশালটা এক ঝটকায় গিল্টি মিয়ার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আরেক দিকে ছুঁড়ে দিল গার্ডদের একজন।

ব্যথায় মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে রানা। চোখে আলো অসহ্য লাগছে আবার শুরু হলো পুরোহিতদের সম্মিলিত মন্ত্রপাঠ। জল্লাদ ফিরে এলো হুইলের কাছে। শমিকে নিয়ে খাঁচাটা আবার তরল পাথরের দিকে নামতে শুরু করল রাজ মালহোত্রা এতক্ষণে আবার হাসল। শুকদেব ধাওয়ান শয়তানের স্তুতি গাইল। গার্ড একটা ছুরি বের করে গিল্টি মিয়ার গলায় ধরল। 'থামো,' বলল রানা, মেঝে থেকে সিধে হচ্ছে। 'ও আমার ভাগে পড়েছে।' আততায়ীর হাত থেকে গিল্টিমিয়াকে তুলে নিল ও, বয়ে নিয়ে এলো কয়েক পা, তারপর দু'হাত দিয়ে গহ্বরের সরাসরি মুখে ঝুলিয়ে ধরল। আতংকে চোখ বিস্ফারিত, নিচের ফুটন্ত লাভার দিকে তাকাল গিল্টি মিয়া।

রানা চোখ মটকাল। 'আমি এখন জেগেছি,' ফিসফিস করল ও। 'তুমি রেডি?'

জবাবে চোখ মটকাল গিল্টি মিয়াও।

তাকে ফাঁকা ও নিরাপদ একটা জায়গায় ছুঁড়ে দিয়ে ঘুরল রানা, একজন পুরোহিতের মুখে ধাই করে ঘুসি মারল; লোকটা তখনও পড়েনি, আরেক পুরোহিতকে লাথি মেরে ফেলে দিল ও।

কারাতে জানে না, তবে কি রকম ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়াতে হয় এটা শেখা আছে গিল্টি মিয়ার—তাতেই কাজ হলো, গার্ডরা কেউ কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না এই সুযোগে এদিক-ওদিক ছুটে গিয়ে বিশেষ করে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ পুরোহিতদের

পিছন দিকের নরম জায়গায় কষে লাথি মারছে সে। 'দাঁড়া শালারা, তোদের ভীমরতি বার করছি!'

দু'জন পুরোহিত রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিছন থেকে তাদের একজনের জটা ধরে ঝুলে পড়ল গিল্টি মিয়া। দ্বিতীয় পুরোহিতকে দু'হাতে শূন্যে তুলে জল্লাদের দিকে ছুঁড়ে মারল রানা।

জল্লাদ ও পুরোহিত দু'জনই প্ল্যাটফর্ম থেকে ছিটকে পড়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, হ্যান্ডব্রেক এনগেজ করেনি জল্লাদ, ফলে শমিকে নিয়ে লোহার খাঁচা নেমে যাচ্ছে গহ্বরের ভেতর।

লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ল রানা, ঘুরন্ত হুইল থামাল ব্রেকে চাপ দিয়ে। নির্ঘাত মৃত্যুর দিকে শমির পতন আরও একবার থেমে গেল।

শুকদেব ধাওয়ান শঙ্কিত বোধ করছে। বেদির ওপর রাখা পবিত্র রত্নগুলোর দিকে এগোল সে।

আরেক পুরোহিত ধূপ-ধুনোর পাত্রটাকে অস্ত্র বানিয়ে তেড়ে মারতে এলো রানাকে। রানা তার পথ থেকে না সরে ঝুঁকল, তারপর পুরোহিতের নিচে সিধে হলো, গতির ঝোঁকই লোকটাকে ওর পিঠের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল গহ্বরের ভেতর। ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করে কয়েকটা আওয়াজ হলো, এক দু'সেকেন্ডের মধ্যে পুরোহিতের ছাইয়েরও বোধহয় কোন অস্তিত্ব থাকল না। তরল, ফুটন্ত ও সচল লাভা সবই হজম করে ফেলেছে।

জল্লাদ আবার প্ল্যাটফর্মে উঠছে দেখে ঝেড়ে একটা লাথি মারল রানা, এবার লোকটা একটা পাথুরে স্তম্ভের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে জ্ঞান হারাল।

আরেক পুরোহিত একটা মোটা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসছে। স্যাঁৎ করে এক পাশে সরে দাঁড়াল গিল্টি মিয়া। লাঠির বাড়িটা পড়ল শুকদেব ধাওয়ানের শিরদাঁড়ায়।

হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ল ধাওয়ান। ছুটে এসে রানা তাকে শেষ করবে, এই সময় ওর দিকে তাকিয়ে হাসল প্রধান পুরোহিত, পরমুহূর্তে বেদির গোড়ায় বসানো গোপন একটা ট্র্যাপডোর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছুটে প্ল্যাটফর্মে ফিরে এসে হুইলটা ঘোরাচ্ছে রানা। একটু একটু করে গহ্বরের মুখ থেকে উঠে আসছে খাঁচাটা। অজ্ঞান শমি এখনও ফাঁদে আটকে আছে, এখনও তার কাপড়চোপড় থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

ছোরা হাতে রানার পিছনে উদয় হলো রাজ মালহোত্রা।

'সার, পিচনে!' গলা ফাটাল গিল্টি মিয়া, গার্ড ও পুরোহিতদের মুখ লক্ষ্য করে এখন আরেকটা মশাল চালাচ্ছে সে।

সময় মত ঘুরে ছোরার আঘাতটা এড়াল রানা, হুইলের পাশে দু'জন ওরা ধস্তাধস্তি শুরু করল। নিচে লোহার ফ্রেম ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে দুলছে।

ফাটলের ওধারে জড়ো হওয়া উপাসকরা এতক্ষণ নীরব দর্শক হয়ে থাকলেও, আসন্ন বিপদের গন্ধ পেয়ে এবার তারা বিভিন্ন গুহাপথে কেটে পড়ছে। সবার আগে পালাল খুদে মহারাজা, দেহরক্ষীরা তাকে নিশ্ছিদ্রভাবে ঘিরে রেখেছে।

রাজ মালহোত্রা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ব্রেক রিলিজ করে দিল। নিয়ে খাঁচাটা আবার নামছে। ছুটে এসে প্রাইম মিনিস্টারের নিতম্বে দি ম্যারাডোনার গোল কিক্ নেয়ার কায়দায় শূট করল রানা। প্লাটফর্ম থেকে উঠল মালহোত্রা, হুইলের ওপর গিয়ে পড়ল, একটা পায়ের প্রায় সব ক'টা দু'সারি স্পোক-এর মাঝখানে আটকে যাওয়ায় মট-মট করে হাড় ভাঙার উঠল। তবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ক্রল করে সরে গেল সে।

সাহায্য করছে গিল্টি মিয়া, হুইল ঘুরিয়ে খাঁচাটা প্ল্যাটফর্ম বরাবর তুলে আনল রানা। ছুটে ফাটলের কিনারায় চলে এলো ও, বাস্কেটটাকে নিয়ে মেঝেতে টেনে নিল।

দ্রুত হাতে শমির বাঁধন খুলল রানা। সে অজ্ঞান, নাকি মারা গেছে? 'শমি! শমি! প্লীজ! ওঠো!' দীর্ঘ একটা সময় ধরে কি কি দুঃস্বপ্ন দেখেছে তার আর প্রায় কিছুই এখন মনে করতে পারছে না রানা, শুধু মনে আছে শমিকে সে জীবিত ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করে সফল হয়নি। তাকে একপাল শিয়াল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে।

ওর বুকটা কি এক অসহ্য কষ্টে মোচড় দিয়ে উঠল। 'শমি!' শেষবার ডাকল ও, জানে মেয়েটা কোনদিনই আর সাড়া দেবে না।

'আমার সিসটার মারা গেচেন!' দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল গিল্টি মিয়া।

আর ঠিক তখনই গুঙিয়ে উঠল শমি।

বোকার মত ফিক করে হেসে ফেলল গিল্টি মিয়া। 'দেকেচেন, কেমন পাজী মেয়ে, দেকেচেন! মটকা মেরে দেকচিলেন আমরা ওনার জন্যে কাঁদি কিনা।'

রানা শুধু নিঃশব্দে হাসছে। 'শমি, এই দেখো, আমি। আমি জেগে উঠেছি, শমি।'

রানাকে দেখে, রানার গলা শুনে মনে মনে শমি বলল, 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আশাটাই পূরণ করলে তুমি—ভগবান, এই দাসী তোমার মহত্ব কোনদিন ভুলবে না।' কাঁদছে, হাসছে, কাশছে—সব একসঙ্গে। ছুরি হাতে মালহোত্রাকে দেখতে পেল সে ঠিকই, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে। 'সাবধান!' বিষম খাওয়ার মত আওয়াজ বেরুল তার গলা থেকে।

ঘুরতে শুরু করে ইচ্ছে করেই পিছন দিকে পড়ে যাচ্ছে রানা, চালানো লাথিটা মালহোত্রার হাত থেকে ছোরাটা খসিয়ে দিল। পরমুহূর্তে ওর ওপর এসে পড়ল মালহোত্রা। দু'জনে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর ধস্তাধস্তি করছে। শমি এত দুর্বল যে নড়তে পারবে না। গিল্টি মিয়া হুইল ছেড়ে নড়বে না।

একবার মনে হলো দু'জনেই গড়াতে গড়াতে ফাটলের কিনারা দিয়ে গহ্বরের ভেতর পড়ে যাবে। কিন্তু না, সরে এলো। তারপর পরস্পরকে ছেড়ে বিচ্ছিন্ন হলো ওরা, দু'জনেই লাফ দিয়ে দাঁড়াল। রানা গহ্বর আর মালহোত্রার মাঝখানে। এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করে ওদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে শমি, সরে যাচ্ছে হুইলটার দিকে।

মালহোত্রা হিন্দিতে বিলাপ করছে। 'তুম মহান শায়তানজীকা সাথ

বেঈমানী কিয়া! ইস কা পরিণতি আচ্ছা নেহি হোগা! তুম জ্বল যাওগে, বরবাদ হো যাওগে, খতম হোকে রাহোগে!' তারপরই লাফ দিল সে। ফ্যানাটিক শয়তান উপাসক কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে রানাকে নিয়ে গহ্বরের ভেতর আত্মহত্যা করতে চায়।

রানা এক পাশে সরে গিয়েও সুবিধে করতে পারল না। তবে ফাটলের কিনারা দিয়ে গহ্বরে নয়, ওকে নিয়ে লোহার খাঁচার ওপর পড়ল মালহোত্রা। খাঁচাটা গহ্বরের সরাসরি ওপরে ঝুলছে এখন।

মালহোত্রার শক্ত থাবা থেকে নিজের ঘাড়টা ছাড়িয়ে নিয়ে লাফ দিল রানা, নাগালে পেল শাফটের ভেতরদিকের ওপরের ঠোঁট, সেটা ধরে ঝুলে থাকল···ঠিক যখন ফেরত পাওয়া সবটুকু শক্তি কাজে লাগিয়ে লিভারটা টেনে ব্রেক রিলিজ করে দিয়েছে শমি। হুইল কর্কশ ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ তুলে ঘুরতে শুরু করল, ফ্রেম বা খাঁচাটা দ্রুত বেগে গহ্বরে নেমে যাচ্ছে। কিছুদূর ওটার সঙ্গে প্রাইম মিনিস্টারও নামল। তবে শমির মত তাকে তো আর বাস্কেটের সঙ্গে বাঁধা হয়নি, ফলে খসে পড়ল গহ্বরের ভেতর।

গলিত লাল লাভা ছলকে উঠল। শমির কানে শব্দটা যেন মধুবর্ষণ করল।

নিজেকে নিরাপদ জায়গায় তুলে আনল রানা। ধীরে ধীরে বসল শমি। ছুটে এলো গিল্টি মিয়া। মুহূর্তের জন্যে সবাই ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল—বেঁচে থাকায় ও আবার এক হতে পেরে নিয়তির প্রতি কৃতজ্ঞ, বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে খুশি।

মন্দির এখন খালি। অজ্ঞান পুরোহিতরা এখনও কেউ নড়াচড়া করছে না। তরল আগুনের হিস্‌হিস্ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও।

রত্ন তিনটের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। এগুলো এখন আর আলো বিকিরণ করছে না। ওর ব্যাগ আর শার্টটা নিয়ে এলো গিল্টি মিয়া। রত্নগুলো ব্যাগে রেখে ব্যাগটা কাঁধে ঝোলাল রানা, একটা চাবুক তুলে নিয়ে জড়াল কোমরে। শার্টটা দিয়ে ঢাকল আহত পিঠ। কিন্তু এদিক-ওদিক অনেক খুঁজেও রানার পাউচটা কোথাও পাওয়া গেল না।

'কি খুঁজছ!' বেদির পিছন থেকে বেরিয়ে এসে জানতে চাইল শমি। 'এটা?' পিছনে লুকিয়ে রাখা পাউচটা সামনে এনে রানাকে দেখাল সে।

'কোথায় পেলে?' বলে পাউচটা নিয়ে ভেতরে তাকাল রানা। সেই বড় হীরেটা নেই।

'বেদির পিছন দিকের গোড়ায় অনেকগুলো খুপরি রয়েছে, সবগুলোয় একটা করে খুদে শয়তানের মূর্তি—ওগুলোর একটার ভেতরে লুকানো ছিল।'

'এতে হীরেটা নেই।'

'নেই, কারণ ওটা আমার কাছে,' বলে কামিজের ভেতর হাত গলিয়ে হীরেটা বুকের মাঝখান থেকে বের করে আনল শমি। 'এটা তো তুমি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে রাজা ভূমিবলের কাছে পাঠিয়েই দেবে, তার আগে পর্যন্ত আমার কাছে থাক?'

রানাকে হাসতে দেখে শমিও হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'খবরদার

বলছি, আমাকে তুমি লোভী মেয়ে ভাবতে পারবে না! লোভী হলে এটা লুকিয়ে ফেলতাম।'

গিল্টি মিয়ার তাগাদায় বেদির পিছনের কামরায় ঢুকল ওরা, সেখান থেকে রওনা দিল খনির মাথার দিকে।

'তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' শমির গলায় সন্দেহ।

'ট্র্যান্সপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে না?' রানা দেখল, খনির প্রায় আর্ধেক কার বিভিন্ন গতিতে রেললাইন ধরে ছুটছে। ওগুলোকে চালাচ্ছে ঘুরন্ত আন্তারগ্রাউন্ড কেইবল। কিছু কার পাথরে ভর্তি, কিছু খালি। একটা খালি কারের দিকে এগোল রানা। ট্রলিটা সেন্ট্রাল কালেকশন টার্মিন্যালে পৌঁছাতেই ওটার সঙ্গে ছুটল কিনারা ধরে থামাবার চেষ্টা করছে। প্রায় হঠাৎ করেই কারটা দাঁড়িয়ে পড়ল যেন নিজের চেষ্টায়।

একটা জোরাল ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানাও। মুখ তুলে তাকাতে দেখল, কারটাকে থামিয়েছে দৈত্যাকার একজন গার্ড। এই দানবটার সঙ্গে আগেও দু'বার সাক্ষাৎ ঘটেছে ওর। দু'বারই তেমন সুবিধে করতে পারেনি ও। ঠিক আছে, হোক তাহলে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিযোগিতা।

মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ওরা। শুরুতেই একটা ঘুসি মারতে যাচ্ছিল রানা, সিদ্ধান্ত বদলে হাতের কাছে একটা বাঁশ পেয়ে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল সেটা। মোটা বাঁশটা মারতেও পারল জায়গামত–লোকটার মাথায়। কিন্তু মাথা নয়, ভাঙল বাঁশটাই।

ব্যথা পাওয়া তো দূরের কথা, গার্ড একচুল নড়েনি পর্যন্ত। ব্যাপারটা সিরিয়াস মনে হচ্ছে।

এগিয়ে এসে খপ করে রানাকে ধরল গার্ড, দুম-দুম করে দুটো ঘুসি মারল ওর বুকে। দড়াম করে পড়ল রানা কারের গায়ে, বুকের সব বাতাস বেরিয়ে গেছে। কিন্তু সামলে নেয়ার আগেই একটানে মাথার ওপর তুলে ফেলল ওকে দৈত্যটা। কার থেকে একটা হাতুড়ি তুলে নিয়েছে রানা, সেটা দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করল লোকটার পাঁজরে। দৈত্য হাসল, তারপর হাতুড়ি সহ রানার হাতটা ধরে মোচড় দিল–ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা, আঙুল থেকে খসে পড়ল হাতুড়ি।

রানার কোমর থেকে চাবুকটা খুলে নিয়ে গরিলার পিঠে সপাং করে বাড়ি মারল গিল্টি মিয়া। একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো ওর মুখ দিয়ে, রানাকে ছেড়ে দিয়েছে গার্ড। মাইন কারের ভেতর পড়েছে রানা। পিঠে হাত দিয়ে ছাল উঠেছে কিনা পরীক্ষা করছে গরিলা, গিল্টি মিয়া আবার চাবুক চালাল। এবার চাবুকটা ধরে ফেলল গার্ড। টান দিতেই খর্বকায় গিল্টি মিয়া নাগালের মধ্যে চলে এলো। তাকে ধরে অনায়াস ভঙ্গিতে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল গার্ড।

রানার পতনের ফলে ঝাঁকি খেয়েছে মাইন কার, আর তাতেই চলতে শুরু করেছে ওটা–কেইবল ওটাকে দীর্ঘ একটা ঢালের মাথায় টেনে নিয়ে চলেছে। দৈত্যটা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল কারে। পাহাড়ে উঠছে ওরা, কারের ভেতর মারামারি ধস্তাধস্তি চলছে। কারের পিছু নিয়ে ছুটছে শমি–কখনও বিস্ময়ে

অভিভূত দর্শকের মত ওদের লড়াই দেখছে, সুযোগ পেলে কখনও গরিলাটার পিঠে পাথর ছুঁড়ে মারছে।

গার্ডের ঘাড়ে দুর্বল একটা স্পট খুঁজে পেয়েছে রানা, লোহার একটা রড দিয়ে ওই জায়গাটা থেঁতো করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ও। কিন্তু যতবারই আঘাত করার সুযোগ পাচ্ছে, প্রতিবার তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে নেতিয়ে পড়ছে।

'কি হয়েছে ওর? সুযোগ পেয়েও মারছে না কেন?' গিল্টি মিয়াকে জিজ্ঞেস করল শমি।

সমস্যাটা কোথায় দেখতে পেয়েছে গিল্টি মিয়া; মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল সে। ওদিকে, মাথার ওপর পরবর্তী কারনিসে, দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌপলের বালক মহারাজা পবনম বৈশাখম। সে তার পাগড়ির পিন মাসুদ রানার হুবহু নমুনা সেই পুতুলটার গায়ে বেঁধাচ্ছে।

মাইন কার ঢালের মাথায় পৌঁছে কাত হয়ে পড়ল, রাশি রাশি পাথরের সঙ্গে দৈত্য আর রানাকেও ঢেলে দিল একটা সচল কনভেয়র বেল্টে। গরিলা কোদাল হাতে সিধে হলো। রানা দাঁড়াল শাবল বাগিয়ে ধরে, কিন্তু পিঠে আর ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা ওঠায় শাবলটা ফেলে কাতরাতে লাগল। গরিলার কোদালটা পড়ল, শেষ মুহূর্তে শরীরটা গড়িয়ে দেয়ায় লাগল না রানাকে।

আরও উঁচু কারনিসে দাঁড়িয়ে ছোট্ট পুতুলের ঘাড়ে ও পিঠে পিন ফোটাচ্ছে খুদে মহারাজা।

শমি খালি একটা কার পেল, মনে হলো অনেকগুলো এগজিট টানেলের একটা দিয়ে বেরিয়ে যাবে ওটা। 'রানা, বেরুতে পারব!' চিৎকার করে বলল সে। 'এদিকে, রানা! আমরা এখন পালাতে পারব!'

রানা অবশ্য কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। কারণ পালা করে একবার গার্ডের ঘুসি এড়াচ্ছে ও, তারপরই আবার কেরোসিনের ক্যান দিয়ে লোকটার খুলি ফাটাবার চেষ্টা করছে।

গিল্টি মিয়া ইতোমধ্যে পথ করে নিয়ে সরু একটা জলপ্রপাতের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওটার পতন ঘটছে চৌপলের মহারাজা যে লেভেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে। পানির সরু ধারাটা নামছে অনেকগুলো বালতিসহ ঘুরন্ত একটা হুইলে। এই আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো ওপরের লেভেল বা স্তরে পানি সরবরাহ করা। গিল্টি মিয়া লাফ দিয়ে পানি ভর্তি নিচের একটা বালতিতে পড়ল, হুইলের সঙ্গে উঠে গেল ওপরের লেভেলে, আবার লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো বালতি থেকে। তারপর কারনিস ধরে ছুটল। এক মুহূর্ত পর দেখা গেল পাজী মহারাজার সঙ্গে লড়ছে সে। লড়ছে মানে, তার হাত থেকে পুতুলটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। তবে কেউই ধরে রাখতে পারল না, জমিনের ওপর ছিটকে পড়ল সেটা।

রানাও কনভেয়র বেল্টের ওপর ছিটকে পড়ল, তবে সেই গরিলার সঙ্গে ধস্তাধস্তি এখনও থামেনি। বেল্টের, বোধহয় ওর নিয়তিরও, শেষ মাথাটা দেখতে পেল রানা। প্রকাণ্ড একটা লোহার হুইল, যে হুইলের দাঁতগুলো নাগালের

মধ্যে যত পাথর আর বোল্ডার পাচ্ছে সব ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবে। কনভেয়র বেল্টটা বিরতিহীন খোরাক যুগিয়ে যাচ্ছে ক্রাশারটাকে। ওটার পেট কোনদিন মেটবার নয়।

শমি দৈত্যটাকে লক্ষ্য করে আরও একটা পাথর ছুঁড়ল। দৈত্য রানাকে ঘুষি মারছে, মাঝে-মধ্যে দু'একটা পাথর ছুঁড়ছে শমির দিকে। রানা ঘুষি এড়ে সবগুলোই এড়াতে পারছে, কিন্তু হাতের কেরোসিন ক্যানটা ঠিক মত তার মাথায় লাগাতে পারছে না। ওদিকে গিল্টি মিয়ার লক্ষ্য পুতুলটা, ওটা নাগালে পাওয়ার জন্যে ছুটছে সে, আর পিছন থেকে তার পিঠে লাঠির ঘা মারছে মহারাজা। লাঠির একটা বাড়ি শিরদাঁড়ায় লাগতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল গিল্টি মিয়া। কাতরে উঠল ব্যথায়। মহারাজা এবার ওর খুলি লক্ষ্য করে লাঠি তুলল। সে সময় মত খপ করে ধরে ফেলে খেঁকিয়ে উঠল গিল্টি মিয়া। 'শিশু নির্যাতনের কেসে ধরা খাব, তাই তোকে কিছু বলছি না, বুজেছিস? তা নাহালে তোর মত দশটা পিচ্চি মহারাজাকে এমন ধোলাই দিতে পারতুম...'

একটু ঢিল পড়ায় মহারাজা লাঠিটা ছাড়িয়ে নিল, তারপর আবার তুলল গিল্টি মিয়ার মাথা লক্ষ্য করে। লাফ দিয়ে সিধে হলো গিল্টি মিয়া, লাঠির বাড়িটা এড়িয়ে মহারাজার সরু গলাটা হাড়সর্বস্ব আঙুল দিয়ে চেপে ধরল। মহারাজা তার পাগড়ির পিন গিল্টি মিয়ার হাতে ঘ্যাচ্ করে বিঁধিয়ে দিল। ব্যথায় কাতরে উঠল গিল্টি মিয়া, গলা ছেড়ে ঢলে পড়ল জমিনে, শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

দৈত্য রানার বাহু ধরে ফেলল, তবে আস্তিনটা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো তার হাতে। একটু ভারসাম্য হারিয়েছে সে, পিছন দিকে হেলে পড়েছে, ক্রাশার হুইলের একটা দাঁত লোকটার ধুতির আলগা হয়ে পড়া কোঁচার নাগাল পেয়ে গেল। আয়রন রোলার টান দিচ্ছে, সেই টান থেকে মুক্ত হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে গরিলা। কিন্তু নাগালে পেলে আর কি ছাড়ে ক্রাশার! দৈত্য অবশ্য ঘাবড়ায়নি। সে ক্ষিপ্রগতিতে কোমর থেকে ধুতি খুলে ফেলছে। রেগে গিয়ে প্রতিবাদ করল গিল্টি মিয়া। 'একজন ভদ্রমহিলার সুমুকে ন্যাংটো না হয়ে মরে যাও না, বাপু!'

তার বাংলা হয়তো বুঝে থাকবে, চোখে খুনের নেশা নিয়ে কারনিসের দিকে মুখ তুলল দৈত্য। অমূল্য একটা সেকেন্ড পার হয়ে গেল। শুধু ধুতি নয়, এবার তার পায়ের একটা আঙুলও আয়রন রোলার-এর নাগালে চলে এলো। বাকিটা সহজেই অনুমেয়। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে গরিলার গলা থেকে দানবীয় আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। তার গোটা শরীর ক্রাশারের তলায় চলে যাচ্ছে-প্রথমে পা, তারপর দ্রুত গোটা শরীর, মাথার চুল পর্যন্ত।

অপর দিক থেকে বেরুল রক্তাক্ত পাথুরে ধুলো।

ওপরের লেভেলে ছুরি হাতে ছুটে এলো মহারাজা, দেয়ালের ব্র্যাকেট থেকে একটা জ্বলন্ত মশাল তুলে নিয়ে আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে প্রস্তুত হলো গিল্টি মিয়া। 'আয়, জন্মের মত শিক্ষা নিয়ে যা!' গিল্টি মিয়া দাঁতে দাঁত চাপছে। মশালটা নিয়ে তেড়ে এলো সে। মহারাজার গায়ে একটা বাড়ি মারতেও পারল

বালক মহারাজা কেঁদে ফেলল, ধপাস করে শক্ত জমিনে বসে পড়েছে। কাঁকর মেশানো মুঠো মুঠো ধুলো এনে মহারাজার জ্বলন্তকাপড়ে ফেলে আগুনটা নেভাচ্ছে গিল্টি মিয়া, তবে প্রয়োজনে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার জন্যেও তৈরি হয়ে আছে। আগুন তাড়াতাড়িই নিভিয়ে ফেলল সে। মহারাজাকে দেখে মনে হলো, এই মাত্র ঘুম থেকে জাগল, এতক্ষণ ঘুমের মধ্যে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল। আসলেও ব্যাপারটা তাই।

তার সামনে বসল গিল্টি মিয়া। এই রূপান্তর আগেও ঘটতে দেখেছে সে। 'ওটা ছিল শয়তানের দেখানো দুঃস্বপ্ন,' মহারাজা পবনম বৈশাখমকে ব্যাখ্যা করল।

মাথা ঝাঁকাল মহারাজা। 'ওরা আমাকে দিয়ে অনেক পাপ কাজ করিয়ে নিয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আপনিও আমার জন্যে দোয়া করবেন, কাকা।'

ওদিকে কনভেয়র বেল্ট থেকে লাফ দিয়ে একটা ক্যাটওয়াকে উঠে পড়েছে রানা। ক্যাটওয়াকটা চলে গেছে খালি একটা ট্রলির দিকে; ওখানে ওই ট্রলিটা নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে শমি। যদিও সময় হাতে খুব কমই, কারণ প্রধান পুরোহিত শুকদেব ধাওয়ান ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে সদলবলে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জায়গাটা ঘিরে ফেলল তারা।

'বড়ভাই, নেমে এসো এখানে,' গলা চড়িয়ে ডাকল শমি। ট্র্যান্সপোর্ট-এর একটা ব্যবস্থা করা গেছে।'

একজন গার্ড ছুটে এলো তার দিকে। মাইন কার থেকে হ্যাঁচকা টানে ব্রেক হ্যান্ডেল খুলে লোকটার মাথায় ধাঁ করে বসিয়ে দিল সে; আরেক গার্ডকে ভয় দেখিয়ে কাছেই ভিড়তে দিল না।

নিচের স্তরে নেমে আসছে গিল্টি মিয়া। ওপর থেকে ঝুঁকে মহারাজা আবেদনের সুরে বলল, 'প্লীজ, শুনুন। বাইরে বেরুতে চাইলে অবশ্যই বাঁ দিকের টানেল ধরতে হবে আপনাদের।'

'ধন্যবাদ।'

রানার বিপদ কাটেনি। ক্যাটওয়াকে, ওর সামনে, উদয় হলো তিনজন গার্ড। পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে রানা। ছোট একটা মই পেয়ে তর তর করে উঠল, সমান্তরাল কারনিসে পৌঁছে ফেলে দিল ওটা, ছুটছে। গার্ডরা পিস্তল তাক করে গুলি ছুঁড়ল এবার। একটা কার্ট-এর পিছনে আড়াল নিল রানা, ওটা ঠেলে পরবর্তী ক্যাটওয়াকে চলে এলো।

লাইনের ওপর ট্রলিটা চালিয়ে দিল শমি, ছোট্ট লাফ দিয়ে উঠতে যাচ্ছে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকা গার্ড ছুটে এসে খপ করে তার একটা পা ধরে ফেলল। ওখানে অবশ্য শমি একা নয়, গিল্টি মিয়াও রয়েছে। মাপমত একটা পাথর তুলে নিল সে, লক্ষ্যস্থির করল, তারপর চিৎকার করে বলল, 'একবার না বলেচি, ইস্তিরিলোকের অসম্মান বরদাস্ত করা হবে না!' পাথরটা ছুঁড়ল সে।

মনে হলো লাগবে না। লাগতও না। লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে গিল্টি মিয়ার দিকে তাকাতে গেল, ফলে তার কানের পাশটা পাঁচিলের মত বাধা হয়ে দাঁড়াল।

শমির পা ছেড়ে দিয়ে পড়ে গেল সে। জ্ঞান হারিয়েছে।

শমির ট্রলি ধীরে ধীরে গতি পাচ্ছে, এই সময় পিছন থেকে গিল্টি মিয়াকে জাপটে ধরল একজন গার্ড। প্রথমে কনুই চালাল গিল্টি মিয়া, তারপর পা। হামলা এড়াবার জন্যে একটু পিছিয়ে গেল গার্ড, আর সেই সুযোগ তিন লাফে পৌঁছে গেল সে ট্রলির কাছে।

গিল্টি মিয়াকে ছুটে আসতে দেখে হাত বাড়িয়ে দিল শমি, টেনে তুলে নিল তাকে। ট্রলির গতি এতক্ষণে আরও বেড়ে গেছে। চারদিকে তাকাতে রানাকে ওরা ক্যাটওয়াকের ওপর দেখতে পেল, এখনও গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে।

'সার, এরপর কিন্তু ট্রেন মিস করবেন!' চেঁচিয়ে বলল গিল্টি মিয়া।

'জলদি, রানা, জলদি!' শমি উদ্বিগ্ন।

ওদের দিকে তাকাল রানা। দেখে নিল সে কোথায় আর ওরা কোথায়, আন্দাজ করল খনির একেবারে শেষ মাথায় একটা বড় এগ্‌জিট টানেলে কতক্ষণে ওরা পৌঁছাবে।

খিঁচে দৌড়াল রানা; কারনিস থেকে মই বেয়ে ক্যাটওয়াকে, ক্যাটওয়াক থেকে লাফ দিয়ে বীম-এর ওপর, সেখান থেকে নিচের একটা ক্যাটওয়াকে। এখন ওকে লক্ষ্য করে চারদিক থেকে গুলি করছে গার্ডরা। উঁচু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে শুকদেব ধাওয়ান। 'ওরা পালাবার পায়তারা কষছে! শয়তানের নামে হত্যা করো ওদের!'

ক্যাটওয়াক থেকে শূন্যে লাফ দিল ও। একটা ভারা-য় পড়ল, কয়েক সেকেন্ড ঝুলে থাকল একটা বাঁশের শেষ প্রান্ত ধরে, তারপর ছেড়ে দিল হাত। ট্রলিটা ইতোমধ্যে বলা যায় তীরবেগে ছুটছে। সময়ের হিসেবে কোন বিচ্যুতি না ঘটায় ওই ট্রলির ওপরই পড়ল রানা—গিল্টি মিয়া ও শমির বাড়ানো চার হাতের ওপর।

অকস্মাৎ গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল ওদেরকে। আর কোন বুলেটের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। টানেলটা কত বড় বোঝার কোন উপায় নেই। সামনে কোন আলো দেখা যাচ্ছে না।

খনিতে দাঁড়িয়ে ট্রলিটাকে টানেলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল শুকদেব ধাওয়ান। হিংস্র আক্রোশে থরথর করে কাঁপছে সে। পাশে দাঁড়ানো সহকারীকে বলল, 'ওরা পবিত্র রত্ন নিয়ে পালাচ্ছে। যেভাবেই হোক, ওদেরকে ধরতে হবে।'

এগারো

আরও খানিক পর টানেলের ভেতর দু'পাশে কিছুদূর পরপর জ্বলন্ত মশাল দেখা গেল, ব্র্যাকেটে আটকানো রয়েছে। রানা দেখল, সামনে রেললাইনটা ইউ টার্ন নিয়ে আবার খনির দিকে ফিরে গেছে। তবে টার্ন নেয়ার আগে অপর অর্ধাংশ

দ্বিতীয় একটা লাইনে সরে যাবার সুযোগ আছে। এই দ্বিতীয় লাইনটাই বেরিয়ে গেছে টানেলের বাইরে। ট্রলির মেঝেতে দুটো শাবল রাখা দেখে ছোটটা তুলে নিল ও, লক্ষ্যস্থির করে অপেক্ষায় থাকল, তারপর রেললাইনের পাশে বসানো একটা সুইচে ঠিক মত একটা বাড়ি মারল। ধাতব আওয়াজ তুলে ট্রলিটা প্রথম লাইন থেকে সরে আর এক লাইনে চলে এলো।

এই লাইনটা একটু পরেই অন্য একটা গুহায় ঢুকল, তারপর দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় পাওয়া গেল না, ডান দিকের লাইন ধরে একটা টানেলে ঢুকে পড়ল ট্রলি।

'আয়-হায়, সার!' গিল্টি মিয়া হতাশ। 'মস্ত মিসটেক হয়ে গেচে। ঢোকা উচিত ছেল বাম দিকের টানেলে।'

কিন্তু এখন আর কারও কিছু করবার নেই। অন্ধকার টানেল এখন ওদেরকে কোথায় পৌঁছে দেয় সেটাই দেখবার বিষয়।

ট্রলি কখনও দীর্ঘসময় নিয়ে নিচে নামল, কখনও অল্প সময় নিয়ে ওপরে উঠল। রানার অনুভূতি হলো, পাহাড়ের আরও গভীরে চলে যাচ্ছে ওরা।

পিছনে, খনির ভেতর, ধাওয়া করার জন্যে লোকজনকে কার-এ ওঠার নির্দেশ দিচ্ছে প্রধান পুরোহিত। রাইফেলধারী গার্ডরা দুটো ওয়াগন-এ চড়ে রওনা হয়ে গেল। তৃতীয় কারটাকে পিছু নিতে বাধা দিল সে। পবিত্র রত্ন চোরদের বিনাশ করার আরও নিশ্ছিদ্র প্ল্যান আছে তার মাথায়। দৃঢ় পায়ে বড়সড় পাশের গুহার দিকে এগোল সে। ওদিকে মূল জলপ্রপাতটা লাফ দিয়ে পড়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড, লেকের চকচকে কালো পানিতে।

শমির খুলে ফেলা ব্রেক হ্যান্ডেলটা জায়গামত আবার লাগাল রানা। প্রয়োজনের সময় স্পীড এখন কমানো যাবে।

গিল্টি মিয়া পিছন দিকে নজর রাখছে, জানে বিপদ আসলে ওদিক থেকেই আসবে।

শমি ট্রলির মেঝেতে বসে আছে। মাথার ওপর সাপোর্ট বীমগুলো দেখতে পাচ্ছে সে, পিছন দিকে ছুটছে। প্রতিটি বাঁক ঘোরার পর বীমগুলোকে আগের চেয়ে কাছে লাগছে। এরমানে, টানেলের ছাদ নিচু হয়ে যাচ্ছে।

কথাটা বলতে যাবে, এই সময় মনে হলো ওদের ট্রলি শূন্যে লাফ দিল! সবাই ওরা ট্রলির পিছনে ছিটকে পড়ল। আসলে শূন্যে লাফ দেয়নি, লাইনটা এখানে প্রায় খাড়া হয়ে নেমে গেছে। তারপর আবার সিধে ও সমান হলো। ব্রেক লিভারে চাপ দিল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে আবার পিছন দিকে তাকাল গিল্টি মিয়া। ওর এই নজরদারির ফল পেতে বেশি দেরি হলো না।

একটা গুলি হলো। গিল্টি মিয়া দেখল ওদের অনেক পিছনে ঠগীদের প্রথম কার বাঁক ঘুরছে। সরল লাইনে পৌঁছাবার পর গার্ডরা আবার গুলি বর্ষণ শুরু করল।

বুলেটগুলো টানেলের গায়েই বেশি লাগছে, তবে ট্রলির পিছনেও দু'একটা

লাগল। ট্রলির ভেতর মাথা নিচু করে বসে আছে ওরা। 'গিল্টি মিয়া, এদিকে এসে ব্রেক ধরো!' বলল রানা।

ব্রেক হ্যান্ডেল থরথর করে কাঁপছে, গিল্টি মিয়া দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল।

ট্রলির পিছন দিকে চলে এলো রানা। 'বাঁক ঘোরার সময় স্পীড কম,' গিল্টি মিয়াকে নির্দেশ দিল। 'তা না হলে লাইন থেকে উড়ে যাব।'

'ইয়েস সার, বুজেচি!'

সঙ্গে করে একদল লোককে জলপ্রপাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে শুকদেব ধাওয়ান। ঠিক জলপ্রপাতে নয়, নিয়ে যাচ্ছে আসলে প্রকাণ্ড একটা জলাধারের দিকে—জলপ্রপাতের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন প্রবাহ যেখানে জমা হয়। জিনিসটা বিশাল, গোলাকার একটা লোহার গামলার মত, বাঁশ আর পাথরের কীলক বা খোঁটা গুঁজে আটকে রাখা হয়েছে—গোটা আয়োজনটা খুবই স্পর্শকাতর, একটু এদিক ওদিক হবার উপায় নেই···

শুকদেব ধাওয়ান তার লোকজনকে সঙ্গে স্লেজ হ্যামার বা বড় আকৃতির হাতুড়ি নিতে বলে দিয়েছে।

রানার ওয়ালথারে গুলি আছে মাত্র ছ'টা। আরেকটা বাঁক ঘোরার সময় গুলি করল ঠগীরা। গিল্টি মিয়া ট্রলির স্পীড কমিয়ে আনল। সুযোগ পেয়ে এই প্রথম রানাও একটা গুলি করল। পিছনের কার থেকে একজন রাইফেলধারী ঠগী বুকে হাত চেপে ধরে নিচে পড়ে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তে শূন্যস্থান পূরণ করল আরেক ঠগী। শুধু তাই নয়, দুই ট্রলির দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে।

সিলিংও আবার নিচে নেমে আসছে। সাপোর্ট বীমগুলো ওদের মাথার একদম কাছ দিয়ে ছুটছে। ট্রলির মেঝেতে বসে পিছন দিকে গুলি করতে হচ্ছে রানাকে, দাঁড়াবার চেষ্টা করলে মাথা বলে কিছু থাকবে না। ওর শেষ গুলিটা বাঁশের সিলিঙে ঢুকে গেল। একজন ঠগী ভাল করে লক্ষ্যস্থির করবার জন্যে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করে নিল সে—ছুটে আসা বীমে লেগে চুরমার হয়ে গেল খুলি, শরীরটা ছিটকে পড়ল লাইনের বাইরে। হালকা হয়ে যাওয়ায় ঠগীদের কারের স্পীড বেড়ে গেল আরও।

'মাথা নামাও! শুয়ে পড়ো!' প্রায় গর্জে উঠল রানা। 'ওরা চলে এসেছে!'

শুকদেব ধাওয়ানের লোকজন প্রকাণ্ড জলাধারের নিচে বাঁশ ও পাথুরে খোঁটার গোড়ায় নিয়মিত ছন্দে হাতুড়ির বাড়ি মারছে। কয়েকশো টন পানির চাপ অবলম্বনগুলোকে জায়গা মত শক্ত ও স্থির করে রেখেছে। তবে শুকদেব ধাওয়ান মোটেও উদ্বিগ্ন নয়। প্রতিটি আঘাতে দুর্বল হচ্ছে ওগুলো, জানে সে। এক সময় অবশ্যই গোঁজগুলো নড়ে যাবে। তখন জলাধারটা গড়াবে, ঢেলে দেবে সমস্ত জল।

'জলদি কারো!' হিন্দিতে হুংকার ছাড়ল সে। 'জোরসে মারো!'

রানার নির্দেশে ব্রেক রিলিজ করে দিয়ে গিল্টি মিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'সার, আমার

কচিটা কি! সামনে বাঁক পড়লে যে ভর্তা হয়ে যাব!'

'যাই যাব, আগে ওদেরকে তো খসাই!' বলল রানা। সামনের বাঁকটা লাইনের প্রায় আধইঞ্চি ওপর দিয়ে উড়ে পার হলো ওরা, লাইনে ফিরে এলো বজ্রপাতের মত যান্ত্রিক গর্জন তুলে। পিছু ধাওয়ারত কার এদিক ওদিক এমন দুলছে, মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে কাত হয়ে পড়ে যাবে।

সামনে আরেকটা বাঁক। রানা ব্রেক ছুঁলোই না, দু'চাকার ওপর ভর দিয়ে ছুটছে ট্রলি। 'উল্টোদিকে থাকো সবাই!'

ঠগীদের কার, ঠিক পিছনেই, বাঁকটা ঘুরছে প্রায় ফুলস্পীডে। ওটার ওজন অবশ্য বেশি, লোকজনও বেশি। ফলে লাইনে থাকতে পারল না।

কারটা উড়ল কাত হয়ে। গার্ডদের মাথাগুলো পশের পাথুরে দেয়ালে বাড়ি খাওয়ায় বিস্ফোরণের যে আওয়াজ হলো, মনে হলো গোটা টানেল ধরে কেউ যেন ঝাঁকাচ্ছে।

রানার কার রকেটের গতিতে দূরে চলে আসছে। ঠগীদের দ্বিতীয় কার সামনে পেল প্রথম কারের ধাতব ও রক্ত-মাংসের স্তূপ। একই পরিণতি ঠেকাবার জন্যে ব্রেক টেনে ধরল ড্রাইভার।

রানার ঠোঁটে নির্মম হাসি। 'একটা গেল, আর একটা বাকি।'

অতিকায় জলাধারের নিচের খুঁটাগুলোয় গার্ডরা নিষ্ঠার সঙ্গে বিরতিহীন আঘাত করে চলেছে। অবশেষে পাথরের একটা গোঁজ ভাঙতে শুরু করল, তারপর চাপের বন্টন বদলে যাওয়ায় ফাটল ধরার গতি দ্রুততর হয়ে উঠল।

গার্ডদের মাথার অনেক ওপরে জলাধার সামান্য একটু কাত হলো। কিনারা থেকে ছলকে পড়ল খানিকটা পানি।

ট্রলির মেঝে থেকে দু'হাতে ধরে ভারী শাবলটা তুলল রানা। মাথা নিচু করে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। আরও এক পশলা বুলেট বৃষ্টি থামতে শাবলটা ছুঁড়ে দিল ট্রলির পিছনে লাইনের ওপর।

লাইনের ওপর বার কয়েক লাফাল ওটা—বার কয়েক মানে ঠগী অনুসরণকারীরা দেখতে পেয়ে আতংকিত হবার ও চিৎকার করার সময়টুকু পেল, কিন্তু সংঘর্ষ ঠেকাবার কোন উপায় করতে পারল না। কারটার নাকে লেগে শাবলটা হড়কাতে শুরু করল, লাইনের ওপর গড়াল, তারপর লাফ দিয়ে পথ থেকে সরে গেল কারও কিচ্ছু ক্ষতি না করে।

গার্ডদের দেখে মনে হলো আনন্দে আত্মহারা। রানাকে দেখে মনে হলো অসুস্থ।

'আমাদের হিরোর মাথায় আর কোনও আইডিয়া আসছে না?' কপালের ঘাম মুছে জানতে চাইল শমি।

'আসছে। শর্ট কাট,' বলল রানা। লাইনের পাশের আরও এক সেট সুইচ ও লিভারে রডের বাড়ি মারল ও। দিক বদলে একটা সাইড টানেলে ঢুকে পড়ল ট্রলি। এক মুহূর্ত পর দ্বিতীয় ট্রলিটা অন্য এক লাইন ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'শত্রুপক্ষ চলে গেল,' বলল গিল্টি মিয়া, চোখে-মুখে রাজ্যের সন্দেহ। 'কোতায় গেল?' এত সহজ সমাধান হবার তো কথা নয়।

সহজ সমাধান নয়ও। ঠগীদের কার্টটা অকস্মাৎ অন্য এক টানেল থেকে বেরিয়ে এলো—সমান্তরাল একজোড়া লাইনে, সরাসরি ওদের পাশে।

একজন গার্ড পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করল। কিন্তু টার্গেট সবই ট্রলির মেঝেতে বসে পড়েছে। হঠাৎ শুধু একটা হাত বিদ্যুৎবেগে ওপরে উঠল, ব্যারেল ধরে হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল রাইফেলটা। হাতে অস্ত্র পেয়েই সবেগে সেটা ঘোরাল রানা, বাঁটের আঘাত একজনের চোয়াল একেবারে গুঁড়ো করে দিল।

আরেক গার্ড গিল্টি মিয়ার হাত ধরে টান দিল।

'সার, আমাকে লিয়ে গেল—!'

গিল্টি মিয়ার অপর হাতটা ধরে ফেলল রানা। তাকে নিয়ে টাগ-অভ-ওঅর চলছে, গার্ডের পাঁজরে রাইফেলের মাজল দিয়ে জোরসে এক গুঁতো মারল শমি।

ফলে টানাটানির প্রতিযোগিতায় রানা জিতল, দুই কারের মাঝখান থেকে নিজেদের কারে ফিরে এলো গিল্টি মিয়া, ধপাস করে বসে পড়ল মেঝেতে। ঠিক সেই মুহূর্তেই আরেকজন গার্ড লাফ দিয়ে সরাসরি গিল্টি মিয়ার পাশে এসে নামল। নেমেই পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল রানাকে।

একপাশ ফিরে পিছন দিকে হেলান দিল রানা, ওর পিঠে চড়ে বসা গার্ডের পিঠ ছুটন্ত পাথুরে দেয়ালে ঘষা খেলো। সামান্য একটু ঘষাই যথেষ্ট, লোকটার বন্ধন থেকে সহজেই নিজেকে মুক্ত করতে পারল রানা। শরীর ঝাঁকিয়ে পিঠের বোঝা লাইনের পাশে ফেলে দিল।

দ্বিতীয় কার গজ পাঁচেক পিছিয়ে পড়েছে, তবে রাইফেলধারী ঠগীরা এখন গুলি করার চেয়ে নিচু হওয়াতেই বেশি ব্যস্ত। ছাদটা নেমে আসছে নিচে।

'নিচু হও!' চিৎকার করল রানা। মাথায় নতুন একটা আইডিয়া এসেছে। রডটা দু'হাতে ধরে মাথার ওপর ঝুলে থাকা ডাম্পার রিলিজ-এ আঘাত করল, পরমুহূর্তে ঝপ করে শুয়ে পড়ল ট্রলির মেঝেতে।

ডাম্পার থেকে রাশি রাশি পাথর, কাঁকর, ধুলোর পাহাড় নেমে এলো ট্রলি দুটোর ওপর। পিছনের কারটাই বেশি আক্রান্ত হলো— একজন গার্ডের খুলি ফেটে মগজ বেরিয়ে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। তারপর লাইনে জমা হওয়া আবর্জনার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গোটা কার শূন্যে লাফ দিয়ে বাড়ি খেলো দেয়ালের সঙ্গে। পিছনে ধুলোর মেঘ ফেলে রেখে প্রথম কার তুফান তুলে ছুটে চলেছে।

বাঁচার আশা ছেড়েই দিয়েছিল শমি। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ আর কিছু ঘটছে না দেখে একটু উঁচু হয়ে সামনে একবার তাকাল। তাকাতেই দেখতে পেল বিশ ফুট সামনে লাইন শেষ হয়ে গেছে। আতংকে চোখ বুজল সে।

ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে লাইনের শেষ মাথায় পৌঁছাল ওদের ট্রলি। ভাগ্যের সকৌতুক বদান্যতা হলো এই যে লাইনের সামনে পাঁচ ফুটী একটা খাদ রয়েছে, কিনারা থেকে ট্রলিটা শূন্যে লাফ দিল ঠিকই, দূরত্বটা পারও হলো, তারপর আবার একজোড়া লাইনেই নামল। ট্রলি ওদেরকে নিয়ে আগের মতই ছুটছে। ঝাঁকিটা বেশ জোরেই লেগেছে, তবে কারও কোন হাড়-গোড় ভাঙেনি

ভাঙলে কান্নার শব্দ শোনা যেত।

হেসে উঠল শমি। এ-ধরনের পাগল করা পরিস্থিতিতে সবই মানুষের পক্ষে সম্ভব।

হাতুড়ির বাড়ি বিরতিহীন পড়ছে। পাথরের আরও দুটো গোঁজ ভেঙে এলো। তারপর আরেকটা। প্রায় স্লো মোশনে প্রকাণ্ড জলাধারটা কাত হতে শুরু করল।

গার্ডরা ছুটে পালাবার সময় চিৎকার করছে। শুকদেব ধাওয়ান নিরাপদ দূরত্বে একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধু আওয়াজটাই অবিশ্বাস্য—পৃথিবীর নিজস্ব এঞ্জিন যেন গজরাচ্ছে। প্রকাণ্ড জলাধার কাত হয়ে পড়ল। কান ফাটানো গর্জনের সঙ্গে এক মিলিয়ন গ্যালন পানি নামল গুহার ভেতর, বিশাল সামুদ্রিক ঢেউ-এর মত ঢুকে পড়ছে টানেলগুলোয়।

ওদের নতুন রেললাইন সোজা এগিয়েছে; টানেল একটু নিচু হয়ে নেমে গেছে। 'এবার ব্রেক করতে পারো, গিল্টি মিয়া,' বলল রানা।

হ্যান্ডেল ধরে টানল গিল্টি মিয়া। কাজ করছে না। আরও জোরে টানতে খুলে হাতে চলে এলো হ্যান্ডেল। 'দেকুন, সার। খুলে এলো!' গিল্টি মিয়ার চোখ দুটো বিস্ফারিত।

ঢালটা আরও ঢালু হচ্ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে ট্রলির স্পীড। কার-এর সামনের দিকে ঝুঁকে নিচে ও ভেতরে তাকাবার চেষ্টা করল রানা। দেখল গোটা ব্রেকিং অ্যাপারেটাস প্যাড থেকে আলগা হয়ে ঝুলছে।

সিধে হলো রানা। পরস্পরের দিকে তাকাল তিনজন। সবাই যেন জানে কি করতে হবে। অনেকটা সময় একসঙ্গে রয়েছে না ওরা! শমি ও গিল্টি মিয়া রানার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল। এরপর ছুটন্ত ট্রলির সামনের পাঁচিল টপকাল রানা।

পিছন দিকে মুখ, দু'হাতে কিনারা ধরে শরীরটা ধীরে ধীরে নিচু করল ও। শমি ও গিল্টি মিয়া দুই হাতে ওর জ্যাকেটের কলার ধরে আছে। রেললাইন থেকে ওর নিতম্ব যখন মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে, ট্রলির নিচে একটা পা ঢুকিয়ে দিল ও, ব্রেক প্যাডে লাথি মারবার চেষ্টা করছে। নিচে জমিন অস্পষ্ট একটা ধূসর প্রবাহের মত লাগছে।

একটা পা দিয়ে কার-এর নিচেটা খুঁজে কাজ হলো, আঙুলগুলো আটকাবার একটা জায়গা পাওয়া গেল। এবার অপর পা দিয়ে ব্রেক প্যাড-এর নাগাল পেতে সুবিধে হলো। ধীরে ধীরে, দৃঢ়তার সঙ্গে পায়ের চাপ বাড়াল ও। স্পিনিং ডিস্ক-এর কাছাকাছি ফিরে যাচ্ছে প্যাড।

'এই স্পীড নির্ঘাত খুন করবে আমাদের!' চেঁচিয়ে উঠল শমি। দরদর করে ঘামছে সে, তবে রানাকে প্রাণপণে টেনে রেখেছে। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে সামনে তাকাতেই দেখতে পেল রেললাইন শেষ হয়ে গেছে। সামনে নিরেট পাথরের পাঁচিল।

পাঁচিলটা গিল্টি মিয়াও দেখতে পেল। 'এই ভর্তা হওয়াটাই শুদু বাকি

হেলো!' কাঁদ কাঁদ গলায় বলল সে।

ঘাড় বাঁকা করে রানাও তাকাল। কোন সন্দেহ নেই—ফুলস্পীডে পাহাড় আকৃতির একটা দেয়ালের দিকে ছুটছে ওরা। সংঘর্ষটা প্রথমে ওর সঙ্গেই হবে।

শরীরে যতটুকু শক্তি আছে সব এক করে ব্রেক প্যাডে লাথি মারল রানা। লোহায় বাড়ি খেয়ে ধাতব শব্দ তুলল প্যাডটা। আগুনের ফুলকি ছুটল চারদিকে। রানার জুতোর তলা গরম হয়ে উঠছে, কিন্তু ব্যথা অনুভব না করার প্রতিজ্ঞায় মনটাকে অটল রাখতে পারল ও, সমস্ত মনোযোগ ঢেলে পায়ের চাপ শুধু বাড়িয়ে যাচ্ছে, পাঁচিলটার কথা ভেবে শক্তি অপচয় করছে না।

কিন্তু না ভাবলে কি হবে, পাঁচিল কাছে চলে আসছে।

তবে আগের মত দ্রুত নয়। চাপ বাড়াতে শুরু করে গোঙাচ্ছে রানা, ব্রেক প্যাড থেকে ধোঁয়া ছুটছে। ট্রলির গতি আরও কমল। পাঁচিল সামনে এসে পড়েছে। রানা ওর গোটা শরীর দিয়ে চাপ দিচ্ছে। আরও মন্থর হলো কার। রানা এখনও চাপ বাড়াচ্ছে।

পাঁচিল আর মাত্র দু'গজ সামনে। ট্রলি দাঁড়িয়ে পড়ছে। তারপর পাঁচিলটা ওর পিঠের নাগাল পেয়ে গেল। পাখির পালকের মত নরম ছোঁয়া অনুভব করল রানা শিরদাঁড়ায়।

দাঁড়াল রানা, খুঁড়িয়ে সরে এলো কয়েক পা, বুট থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। 'পানি!'

ক্যাব থেকে ওরা দুজনও নামল। নার্ভাস। মুখে আড়ষ্ট হাসি।

ওরা দেখল, ওদের বাঁ দিকে এগিয়েছে টানেলটা, তবে সেদিকে কোন রেললাইন এগোয়নি। কাজেই ওদেরকে হাঁটতে হচ্ছে।

খানিক পরই ওদের গায়ে বাতাস লাগল। সেই বাতাস ঝড় হয়ে উঠছে: তারপর অদ্ভুত এক গমগমে গর্জন ভেসে এলো। পিছনের টানেলগুলোয় শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দু'পাশের দেয়াল ও সিলিং-এ কাঁপুনি ধরে গেল।

গোটা ব্যাপারটা ভীতিকর। চোখে অনিশ্চিত দৃষ্টি নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, কাঁধ ঝাঁকাল, হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল আগের চেয়ে। বিশেষ করে বাতাসটা রানাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। মাটির এত নিচে এরকম জোরাল বাতাস কিভাবে বয়?

গর্জনটা ক্রমশ বাড়ছে। কাঁধের ওপর দিয়ে ঘন ঘন পিছন দিকে তাকাচ্ছে ওরা। কিছুই নেই। 'রানা?' শমির গলা বেসুরো শোনাল।

কি ঘটছে রানা জানে না, তবে ভয়ানক কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মত লাগছে আওয়াজটা ওর কাছে। শমির হাতটা খপ করে ধরল ও, তারপর তিনজনে শুরু করল দৌড়।

কাঁপুনি ও গর্জন বেড়েই চলেছে। সিলিং থেকে ছোটখাট পাথর, পচা বাঁশের টুকরো, ধুলো ইত্যাদি খসে পড়ছে। পায়ের নিচে জমিনও কাঁপছে। ভূমিকম্প?

এবার জোরে দৌড়াচ্ছে ওরা। তবে জানে না কেন।

গর্জনটা এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। শমি আবার পিছনে তাকাল। হঠাৎ ছোটার গতি কমাল সে, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। হতবিহ্বল, পঙ্গু হয়ে গেছে

সে। অবিশ্বাসে চোখ দুটো বিস্ফারিত।

ওদের পিছনে পানির গোটা একটা সচল পাহাড়, অনেক পিছনে আড়াআড়ি একটা টানেলের দেয়াল ও কিনারাগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।

দূরে, তবে তত দূরে নয়। শমি বিড়বিড় করল, 'কী ভয়ঙ্কর!'

রানা ও গিল্টি মিয়া শমিকে পাশে না দেখে থমকে দাঁড়াল। পানির তীব্রগতি ছুটে আসা দেখে হাঁ করে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর এগিয়ে এসে আবার শমির হাত ধরল রানা। এবার ছুটল ওরা বদ্ধ পাগলের মত।

সামুদ্রিক স্রোতের মত, যেন জ্যান্ত একটা হিংস্র প্রাণী, সগর্জনে ধাওয়া করছে ওদের বিপুল জলরাশি। অসংখ্য টানেল থেকে সংগ্রহ করা আবর্জনার মধ্যে রয়েছে পাথর, বোল্ডার, মানুষের লাশ, মরা ইঁদুর, লোহার যন্ত্রপাতি, কোদাল, শাবল, ট্রলি—বেশিরভাগই স্রোতের সামনে জমে ওঠা ফেনায় ডুবে আছে। নাহ্, এই মহা বিপদ থেকে ওদের বাঁচার কোন উপায় নেই। শুধু হয়তো বা সামনের বাঁকে ছোট সাইড টানেলটা…

'ওই যে, ওখানে!' বিপুল জলরাশির গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল রানার চিৎকার। 'ডাইভ দাও!'

গর্ত লক্ষ্য করে লাফ দিল ওরা। প্রথমে গিল্টি মিয়া, ভাবটা যেন সীট দখল করার প্রতিযোগিতায় জিততেই হবে তাকে। শমিকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল রানা, তার পিছু নিয়ে নিজেও ঢুকল—ঠিক যে-মুহূর্তে মেইন শাফটে বিস্ফোরিত হলো জলোচ্ছ্বাস।

সরু চ্যানেল নিচের দিকে ঢালু। ভারী বস্তার মত গড়িয়ে ও হড়কে নেমে যাচ্ছে ওরা, মূল স্রোত থেকে আলাদা হয়ে সরু টানেলে ঢুকে পড়া পানির ক্ষীণ একটা ধারা গোসল করাচ্ছে ওদেরকে। পৌঁছাল বড় একটা টানেলে। 'বেশ মজাই লাগল। এক মিনিট। আরেকবার হড়কে আসি!' বলে ঘুরতে গেল গিল্টি মিয়া।

রানা তার পথ রোধ করায় সে অবশ্য এক পাও এগোতে পারল না। এই বড় টানেলটা ঢালু হয়ে ওপরদিকে উঠে গেছে। শেষ মাথায় আলোও দেখতে পাচ্ছে শমি। কথাটা বলতে যাবে, এই সময় ওদের পিছনে নতুন একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো। ঘাড় ফেরাতে তিনজনই ওরা দেখতে পেল পানির সেই স্রোতটাই কিভাবে যেন ওদের এই টানেল ধরে বিপুল বেগে নেমে আসছে।

তিনজনই দিনের আলো লক্ষ্য করে প্রাণপণে ছুটল। নির্দয় পানির তোড় ছুটন্ত পাহাড়ের আকার নিয়ে ধাওয়া করছে ওদেরকে।

টানেলের মুখে পৌঁছাল ওরা, পানির সামনের ঝাপটাগুলো নাগাল পেয়ে গেল ওদের পিঠের। ওরা বেরিয়ে এলো সূর্যালোকে…

পরমুহূর্তে দেখা গেল তিনজনই কিনারায় দাঁড়িয়ে টলমল করছে। টানেলটার মুখ বের হয়েছে একটা পাহাড়-প্রাচীরের মাঝখানে—ওরা তাকিয়ে আছে সরাসরি খাড়া তিনশো ফুট নেমে যাওয়া একটা পাথুরে গিরিখাদের দিকে। হাত দু'দিকে মেলে ভারসাম্য রক্ষা করছে, যেন অনন্তকাল ধরে। তারপর শমিকে ধরে একপাশের সরু একটা কারনিসে নামিয়ে দিল রানা—টানেলের মুখ

থেকে কাছেই ওটা, পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে ঝুলে রয়েছে। চোখ বুজে থরথর করে কাঁপছে গিল্টি মিয়া, তাকেও শমির পাশে নামাতে হলো, সবশেষে রানা নিজেও লাফ দিল টানেলের মুখ থেকে উল্টোদিকের কারনিসটায়। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তাল স্রোতটা ওদের মাঝখানে বিস্ফোরিত হলো। স্রোতের সামনে রয়েছে রেললাইনের স্লিপার, ড্রাম আর সম্ভাব্য সব রকমের আবর্জনা, এমনকি একটা মাইন কারও রকেটের বেগে ওদেরকে পাশ কাটাল। সবই ডিগবাজি খাচ্ছে পানির ভেতর।

ভয়ে ভয়ে নিচে একবার তাকাল বটে শমি, মাথাটা ঘুরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে নিতে বাধ্য হলো সে। তবে এক কি দু'সেকেন্ডের মধ্যে যা দেখবার দেখে নিয়েছে। পানির বিশাল প্রবাহটা জলপ্রপাত হয়ে নিচে নামছে। গিরিখাদের তলায় ক্ষীণধারার অগভীর পানিতে। বিশ্রামরত কুমিরগুলো খেপে গিয়ে গা মোচড়াতে শুরু করল।

চারদিকে চোখ বুলাল রানা। খাদটা একশো গজ গভীর হলেও, অপরদিকে এবড়োখেবড়ো প্রাচীরের সামনে বহুদূর বিস্তৃত সমতল ঝোপ-ঝাড় ঢাকা মাটি দেখা যাচ্ছে; মনে আশা জাগায়–নিরাপদ কোথাও ফেরার পথটা ওখানে বোধহয় পাওয়া যেতে পারে। তারপরই ওর চোখে পড়ল ব্রিজটা।

রশি দিয়ে তৈরি সরু একটা সেতু, ওপারে যাওয়ার জন্যে। এদিকে ব্রিজের প্রান্তটা বিশ ফুট ওপরে, আর গিল্টি মিয়া ও শমি পাথর আঁকড়ে ধরে যেখানে ঝুলছে সেখান থেকে বিশ ফুট সামনে। পানির গর্জনকে ছাপিয়ে রানার চিৎকার শুনতে পেল ওরা, 'শমি, ব্রিজের দিকে এগোও!' হাত তুলে ইঙ্গিতও করল।

ব্রিজের দিকে তাকাল শমি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল। এর কি কোন শেষ নেই? তার কান্না পাচ্ছে। তবে গিল্টি মিয়ার অবস্থা আরও করুণ দেখে নিজেকে শক্ত করল সে, তার একটা হাত ধরে অভয় দিল, 'এভাবে কেঁপো না, পড়ে যাবে যে! সাবধানে এসো, আমি ধরে আছি!' সরু কারনিস ধরে ব্রিজের সরাসরি নিচে পাহাড়ের ফুলে ওঠা গা লক্ষ্য করে এগোল ওরা। ব্রিজের নিচে পৌঁছাতে ঘাম ছুটে গেল দু'জনের। কারনিসটা এত সরু যে পা হড়কালে আর মা-বাপকে ডাকারও সুযোগ হবে না। এরপর শুরু হলো ফুলে ওঠা পাহাড়ের গা এড়িয়ে ওপরে ওঠা। গিল্টি মিয়া দেখল, শমি শুধু হাঁপাচ্ছে না, ভয়ে চোখ বন্ধ করে রেখেছে। 'হাজার হোক আমি একটা পুরুষমানুষ,' মনে মনে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল সে। 'সিস্টার, আমাকে আগে যেতে দিন,' বলে খোপে পা দিয়ে গর্তের কিনারা ধরে বেশ দ্রুতই ওপরে উঠতে শুরু করল সে, লক্ষ রাখছে তার নির্বাচিত খোপ আর গর্তই শমি ব্যবহার করছে কিনা।

রানার সমস্যা আরও কঠিন। মাইন কারের ব্রেকে চাপ দিতে গিয়ে ওর একটা পা জখম হয়েছে। তাছাড়া, ওকে প্রথমে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হবে, তারপর ব্রিজ আর ওর মাঝখানে পড়বে কয়েকটা উষ্ণ প্রস্রবণ।

ব্রিজের শেষ মাথায় শমিকে নিয়ে নিরাপদেই উঠতে পারল গিল্টি মিয়া। ওদের পিছনে অন্ধকার একটা টানেল খনির ভেতর দিকে চলে গেছে। ওদের সামনে রশির সেতু ঝুলে আছে শূন্যে।

গিরিখাদের ওপর ছেঁড়া মাকড়সার জালের শেষ কয়েকটা সুতোর মত ব্রিজটা। খুব কম করেও বয়স হবে একশো বছর।

দু'ধারের রেইলিং রশি দিয়ে বোনা। মেঝেতে বসানো হয়েছে কাঠের তক্তা। তক্তাগুলো পোকায় খেয়ে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। অনেক জায়গা এখন ফাঁকা, অর্থাৎ ওই সব জায়গার তক্তা বহু বছর হলো খসে পড়ে গেছে।

ব্রিজে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে রানার। চিৎকার করে গিল্টি মিয়াকে নির্দেশ দিল, 'তোমরা পার হয়ে যাও।'

শমির হাত ধরে ব্রিজে পা রাখল গিল্টি মিয়া। ধীরে ধীরে, সাবধানে এগোচ্ছে ওরা। তারপর, কিভাবে যেন, ব্রিজের মাঝখানে পৌঁছে গেল দু'জনে। এই সময় ওদের পিছনে রানা এইমাত্র পা রাখল ব্রিজে। তারপর পিছিয়ে এলো রানা। না, ওরা বরং প্রথমে ওপারে পৌঁছাক। পুরানো, আধ পচা রশি তিনজনের ভার না-ও সইতে পারে।

কিন্তু তারপরই পিছনে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। টানেলের মুখ থেকে এক পাশে সরে এসে গা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করল রানা, কোমরে জড়ানো চাবুকটা চলে এলো হাতে। একটু পরই দু'জন ঠগী গার্ড একযোগে বেরিয়ে এলো টানেল থেকে।

সপাং করে চাবুক কষল রানা, প্রথম লোকটার গলার চারদিকে পেঁচিয়ে গেল ওটার ডগা। বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, দ্বিতীয় লোকটা তার গায়ে ধাক্কা খেলো। দু'জনেই আছাড় খেয়েছে, তবে প্রথম লোকটা গলা থেকে চাবুক ছাড়িয়ে দ্রুত সিধে হচ্ছে। তার মাথায় লাথি মারল রানা।

দ্বিতীয় লোকটা এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েই হাতের তলোয়ারটা রানার গলায় বেঁধাবার চেষ্টা করল। নিচু হয়ে গলা বাঁচাল রানা, গার্ডের পেটে দমাদম দু'তিনটে ঘুসি বসিয়ে দিল। লোকটা কুঁজো হয়ে যাচ্ছে দেখে অজ্ঞান প্রথম লোকটার পড়ে থাকা তলোয়ার ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রানা।

দু'জন মুখোমুখি হলো, এখনি শুরু হবে মরণপণ ডুয়েল।

আক্রমণ শুরু হলো হঠাৎ। তার আগে ঠগীর গলা থেকে একটা রোমহর্ষক রণহুঙ্কার বেরিয়ে এলো।

তলোয়ারে তলোয়ারে সংঘর্ষে গা রিরি করা কর্কশ আওয়াজ আর চোখ ধাঁধানো আগুনের ফুলকি ছুটল চারদিকে। ঠগী হামলা করতে এসে করে না, পিছাতে গিয়ে লাফ দিয়ে সামনে বাড়ে। তার কাছ থেকে শিখছে রানা, তবে তার পদ্ধতি উল্টোভাবে ব্যবহার করছে—হামলা করতে গিয়ে করেই বসল, পিছাতে গিয়ে সামনে লাফ দিল না। এক সময় দুই তলোয়ারের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো, ফলে দু'জনের হাত থেকে ছুটে গেল অস্ত্র। পাথুরে ঢালের ওপর প্রথমে ধস্তাধস্তি শুরু হলো, তারপর গড়াগড়ি। ওরা স্থির হলো একটা বুনো ঝোপের ওপর—লোকটা নিচে, রানা ওপরে। বগলের নিচ থেকে আগেই হাতে চলে এসেছে ছুরিটা, প্রতিপক্ষ ঠগীর হৃৎপিণ্ডটা গেঁথে ফেলল রানা ছুরি দিয়ে।

লাফ দিয়ে সিধে হয়েই এক ছুটে ব্রিজে উঠল রানা, তার আগে ঝুঁকে একটা

তলোয়ার তুলে নিয়েছে।

রশির রেইলিং ধরে সাবধানে এগোচ্ছে রানা। কয়েক ফুট পরপরই ওর বুট পচা তক্তা ভেঙে নিচে গলে যেতে চাইছে, তখন রেইলিং ধরে ঝুলে পতনটা ঠেকাচ্ছে ও। সারাক্ষণ সামনের পথের ওপর চোখ বুলাচ্ছে, সম্ভাব্য দুর্বল জায়গাগুলো যাতে আগেই চেনা যায়। এভাবে ব্রিজের প্রায় মাঝখানে পৌঁছেছে, এই সময় সামনে থেকে চিৎকার ভেসে এলো। মুখ তুলতেই দেখতে পেল ব্রিজের অপর প্রান্তে পৌঁছে গেছে মন্দিরের গার্ডরা।

ব্রিজ থেকে শক্ত পাথুরে মাটিতে পা ফেলতে না ফেলতে শমি আর গিল্টি মিয়া ধরা পড়ে গেল গার্ডদের হাতে। নিজেদের মুক্ত রাখার জন্যে ধস্তাধস্তি করল বটে, কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। সংখ্যায় তারা অনেক বেশি।

ব্রিজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, বুঝতে পারছে না এখন কি করবে। অকস্মাৎ শমির চিৎকার ভেসে এলো। 'রানা, পিছনে তাকাও!'

ঘুরল রানা। ওর পিছন দিকে টানেল থেকে আরও গার্ড বেরিয়ে আসছে। আবার ঘুরল ও। শমি ও গিল্টি মিয়াকে যারা ধরেছে তাদের মধ্যে থেকে দু'জন গার্ড টলোমলো পায়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

ঝুলন্ত, দোদুল্যমান সেতুর মাঝখানে অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, গার্ডরা ওকে ধরতে আসছে দু'দিক থেকেই; অনেক নিচে গিরিখাদের তলায় নড়াচড়া করছে প্রকাণ্ড আকারের অনেকগুলো কুমির, মাথার ওপর সুনীল উদার আকাশ।

অসহায়? হ্যাঁ, প্রায়। যত যাই হোক, এ হলো মাসুদ রানা।

শুভ কিংবা হয়তো অশুভ কিছুর বার্তা নিয়ে দমকা একটা বাতাস ছুটে এলো। শুকদেব ধাওয়ান, প্রধান পুরোহিতকে দেখা গেল ব্রিজের শেষ প্রান্তে। ঢোলা কাপড়ে আপাদমস্তক প্রায় ঢাকা তার, আধ লুকানো মুখে এমন একটা তৃপ্তির হাসি, যেন সবগুলো তাসই তার হাতে। পাশে রয়েছে শমি আর গিল্টি মিয়া, গার্ডদের হাতে বন্দী।

বাতাস এখন একটানা বইছে, দোল খাওয়া সেতুতে দাঁড়িয়ে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে রানা। রশি দিয়ে বোনা রেইলিং আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে বলল, 'আমার লোকদের ছেড়ে দাও!'

শুকদেব ধাওয়ানও চিৎকার করল, তবে নিজের লোকদের উদ্দেশে। তারা রানাকে ধরার জন্যে ব্রিজের দু'দিক থেকে সামনে বাড়ল।

'খবরদার!' রানার কঠিন নির্দেশ শোনা গেল। 'আর এক পা-ও কেউ এগোবে না!'

'এগোবে না মানে? না এগোলে ওরা তোমাকে ধরবে কিভাবে?' শুকদেব ধাওয়ান নাটকীয় ভঙ্গিতে কথা বলছে। 'তুমি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। এখন যদি তোমাদেরকে আমরা তাঁর উদ্দেশে বলি না দিই, আমাদের ওপর কঠিন অভিশাপ নেমে আসবে না?'

'ঠিক আছে,' বলল রানা, 'আসুক ওরা।' ইঙ্গিতে কাঁধের ব্যাগটা দেখাল। 'এক ব্যাগে যে গাদা আছে সেগুলো তাহলে আর পাচ্ছ না। ওরা না থামলে

এখনি সব নিচে ফেলে দেব আমি।'

'দাও, ফেলেই দাও,' হেসে উঠে বলল শুকদেব ধাওয়ান। 'তাহলে খুব সহজেই আমরা আবার খুঁজে নিতে পারব। তবে মুখেই বলছ, আসলে ফেলবে না।' তারপর গার্ডদের নির্দেশ দিল, 'আগে বাড়ো! দুশমনকে পাকাড়কে লে আও!'

গার্ডরা সাবধানে এগোচ্ছে। এমনিতেই দুলছে ব্রিজ, তার ওপর মাঝখানে দাঁড়িয়ে উন্মাদ লোকটা দু'হাতে দু'দিকের রেইলিং ধরে যত জোরে পারা যায় ঝাঁকাচ্ছে ওটাকে।

কোন কাজ সহজে কেন সারা যায় না? হয়তো কারও বিরুদ্ধে নয়, তবে মনে ক্ষোভ নিয়ে ভাবল রানা। তারপর, বিনা নোটিশে, সবেগে তলোয়ার চালিয়ে রশি দিয়ে বোনা এক দিকের রেইল কাটতে শুরু করল।

টান টান রশিতে ঢিল পড়ায় ব্রিজ কাত হয়ে গেল একদিকে, গার্ডরা নিজেদের পতন কোন রকমে ঠেকিয়ে উল্টোদিকের অক্ষত রেইলিং আঁকড়ে ধরল। সামনে এগোবে কি, এখন তাদের পক্ষে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই দায় হয়ে উঠেছে, কারণ পায়ের নিচের পাকানো রশিও কাটছে রানা, যে রশি তক্তাগুলোকে রেইলিঙের গোড়ার সঙ্গে জায়গামত বসিয়ে রেখেছে।

রশিগুলো রানা আংশিক কাটছে, যাতে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন না হয়। তবে ওর হিসেব ভুল প্রমাণিত করে পচা রশি সবগুলো দু'ভাগ হয়ে গেলে সর্বনাশের আর বাকি থাকবে না কিছু।

প্রধান পুরোহিত মাথা ঝাঁকাল, ভঙ্গিটা প্রশংসাসূচক। 'সত্যি দেখাচ্ছ বটে! তবে আমি বিশ্বাস করি না তুমি আত্মহত্যা করতে চাও।' গার্ডদের উদ্দেশে আবার ইঙ্গিত করল সে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ব্রিজ ধরে এগোবার চেষ্টা করল তারা—আসলে নির্দেশ অমান্য করার সাহস নেই বলে এগোবার ভান করছে, সত্যি সত্যি খুব একটা এগোচ্ছে না।

রানা আরও এক প্রস্থ রশি কাটল। এবারও আংশিক, বিচ্ছিন্ন হলো না। তারপর দ্বিতীয় রেইলিং চিরে দিল।

কিছু ধরে তাল সামলাবে বা সিধে হয়ে থাকবে, এমন কিছু নেই আর। রানা ও গার্ডরা তক্তার ওপর বসে পড়ল, ব্রিজ প্রবল বাতাসে শুধু দুলছে না, তক্তার মেঝে ঘন ঘন এদিক-ওদিক কাত হচ্ছে।

শুকদেব ধাওয়ানের মুখের হাসি হারিয়ে গেল। শমি আর গিল্টি মিয়াকে ঠেলে ব্রিজে তুলল সে, তাদেরকে ঢাল হিসেবে সামনে রেখে রানার দিকে এগিয়ে আসছে। ঢোলা পোশাকের ভেতর থেকে তার হাতে একটা ভাগার বেরিয়ে এসেছে, সেটা শমির পিঠে ঠেকাল। 'তোমার বন্ধুরাও তোমার সঙ্গে মারা যাবে!' গর্জে উঠল সে।

সামনে ও পিছনের গার্ডদের দিকে তাকাল রানা। ব্রিজের গোড়া থেকে দশ ফুট এগিয়ে আসা শমি ও গিল্টি মিয়াকে দেখল, তাদের পিছনে আক্রোশ আর ক্রোধ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শয়তানের প্রধান উপাসক। গিরিখাদের নিচেটা দেখল। দেখে নিল এমন কি নীল আকাশটাও। 'সেক্ষেত্রে আর কোন উপায় নেই,' মনে মনে বলল রানা।

নেই, সবাইকে বিরাট একটা ডাইভ দিতে হবে!'

রানার দৃষ্টি যেন গিল্টি মিয়ার চোখে বিদ্ধ হলো। নীরব বার্তা বিনিময় হলো সেকেন্ডেরও কম সময়ে—তাতে অতীতের অনেক ঘটনা যেমন স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো, তেমনি ওর ওই দৃষ্টিতে কিছু উপদেশ, পরামর্শ ও প্রতিশ্রুতিও থাকল। চোখ সরিয়ে নিয়ে মাথাটা সামান্য ঝাঁকাল রানা। গিল্টি মিয়া সব বুঝল; তবে স্পষ্ট উপলব্ধি করল, ব্যাপারটা ঠাট্টা নয়।

কিছু একটা শমিও বুঝল। রানার দৃষ্টিতে সে সাহস আর আত্মবিশ্বাসের ছাপ দেখতে পেয়েছে। বাঁচার কি উপায় হবে বুঝতে না পারলেও রানার প্রতি আকর্ষণ তার আরও যেন গাঢ় ও দুর্বার হয়ে উঠল। গিল্টি মিয়ার দিকে তাকাল সে। দেখল তার বড়ভাই চুপিসারে নিজের পায়ে আলগা একটা রশি জড়াচ্ছে। ভয়ে ও আশঙ্কায় বিমূঢ় হয়ে পড়লেও, জান বাঁচানোর তাগিদ অনুভব করে গিল্টি মিয়ার অনুকরণে সে-ও অন্য একটা আলগা রশি খুঁজে নিয়ে এক পায়ের সাহায্যে আরেক পায়ে জড়াতে শুরু করল বাংলার ৪-এর মত করে।

রাগে গর্জে উঠল শুকদেব ধাওয়ান। 'রত্নগুলো দাও আমাকে!'

'ধাওয়ান, তুমি এখন নরকে শয়তানের সঙ্গে দেখা করতে চলেছ!' বলেই আংশিক কাটা রশিগুলো তলোয়ারের কোপ মেরে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে রানা।

সেতু দু'ভাগ হতে যাচ্ছে, আরও বেশি কাত হয়ে পড়ছে। সবার আগে খসল দু'জন গার্ড। মৃত্যুর দিকে নেমে যাবার সময় সারাটা পথ শুধু চেঁচাল তারা। বাকি সবাই আতংকে পালাতে চেষ্টা করছে। রানা আরেকবার তলোয়ার চালাল, এবার সেতুটা পুরোপুরি দু'ভাগ হয়ে ঝুলে পড়ল। সবাই চেষ্টা করছে ছেঁড়া রশি বা তক্তা ধরে ঝুলে থাকতে। কিন্তু সেতুর দুটো অংশই তো পাহাড়ের প্রাচীরের দিকে ছুটছে। যারা ঝুলে রয়েছে তারা ধাক্কা খেলো পাথরের সঙ্গে। কেউ সামলাতে না পেরে রশি থেকে হাত ছেড়ে দিল। তার গন্তব্য তিনশো ফুট নিচে কুমিরের উদর।

পায়ে রশি জড়ানো থাকায় শমি ও গিল্টি মিয়া তাদের হাত দুটোকে ধাক্কা সামলাবার কাজে ব্যবহার করতে পারল। কিভাবে যেন বিচ্ছিন্ন সেতু ধরে শুকদেব ধাওয়ানও ঝুলে আছে। শুধু ঝুলে নেই, রশি বেয়ে ওপরে উঠতেও শুরু করেছে। তাড়াহুড়ো করে একজন গার্ডকে পাশ কাটাতে গিয়ে তাকে ফেলে দিল শয়তানের চেলা।

রানা সেতুর যে অংশে ঝুলছে তাতেই রয়েছে শমি ও গিল্টি মিয়া। তবে ওর আর ওদের মাঝখানে এখনও একজন গার্ডকে দেখা যাচ্ছে। রানা দ্রুত উঠছে, তবে হাতের তলোয়ার তৈরি রেখেই। কাছাকাছি এসে দেখল গার্ড চোখ দুটো শক্ত করে বুজে বিড়বিড় করছে, 'মহান শায়তানজী মুঝে বাঁচা লিজিয়ে! ইস দাফা বাঁচ শ্যাকুঁ তো আপনে বেটাকো আপকা চরণতলে উৎসর্গ করুঙ্গা...' বলতে চাইছে, এ-যাত্রা বেঁচে গেলে নিজের ছেলেকে বলি দেবে।

তলোয়ারের এক খোঁচায় তাকে নিচে ফেলে দিয়ে তার নিরীহ ছেলেটাকে বাঁচার রাস্তা করে দিল রানা। তারপর শমি ও গিল্টি মিয়াকে পাশ কাটিয়ে খানিক ওপরে উঠতেই নাগাল পেয়ে গেল শুকদেব ধাওয়ানের। তার একটা পা ধরে

রানা বলল, 'এই ব্যাটা, হিসেব না চুকিয়েই যাস কই?'

অকস্মাৎ হড়কে রানার মুখের সামনে নেমে এলো প্রধান পুরোহিত। দু'জন দুই প্রস্থ রশি ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় মারামারি করছে। হঠাৎ রানার বুকের দিকে একটা হাত বাড়াল শুকদেব ধাওয়ান।

দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল শমি, 'সর্বনাশ! সর্বনাশ! রানা, হার্টটা আড়াল করো!'

আকস্মিক হিম আতংকের অনুভূতি নিয়ে রানা দেখল ধাওয়ানের হাত ওর বুকের ভেতর ঢুকতে শুরু করেছে! খপ করে লোকটার কব্জি চেপে ধরল ও, হাতটাকে বুকের ভেতর ঢুকতে প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু ধীরে ধীরে, কাঁপতে কাঁপতে, রানার চামড়া ভেদ করছে জাদুকরের আঙুল, ঢুকে যাচ্ছে শরীরের ভেতর।

হিম ঠাণ্ডা, সেই সঙ্গে গা ঘিনঘিনে একটা অনুভূতি হলো রানার। একে ঠিক ব্যথা পাওয়া বলে না; স্রেফ ওর অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে অনধিকার হস্তক্ষেপ, অন্তরের অন্তস্তলে জেগে থাকা চেতনাকে স্পর্শ করার অন্যায় স্পর্ধা। রানার কপালে ঘাম ফুটল। চোখের সাদা অংশ দ্রুত লাল হয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। এই বুঝি পড়ে গেল!

তবে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি ওর প্রবল; স্নায়ু শক্ত রাখল ও, হৃৎপিণ্ড থেকে দূরে রাখছে ধাওয়ানের মাংস ও হাড়ভেদী আঙুলগুলোকে। তারপর আকস্মিক এক ঝটকায় হাতটাকে সরিয়ে দিল। ধাওয়ান নিজের হাতেই নিজের মুখে বাড়ি খেলো।

মরিয়া হয়ে আবার রশি বেয়ে ওপরে উঠছে ধাওয়ান। সামনে আরও একজন গার্ড পড়ল। পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে খাড়াভাবে ঝুলন্ত ব্রিজ থেকে নিচে ফেলে দিল সে।

গিরিখাদের উল্টোদিক থেকে হৈ-চৈ ভেসে এলো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দশ-বারোজন ঠগীকে দেখতে পেল রানা–টানেল থেকে বেরিয়ে এসে ব্রিজ দেখতে না পেয়ে আক্রোশে গজরাচ্ছে। তাদের উদ্দেশে হুংকার ছাড়ল ধাওয়ান, 'মার ডালো! খতম কারো! তীর চালাও! সবকো বড়িয়া ইনাম মিলে গা! মার ডালো!'

টানেল থেকে কারনিসে বেরিয়ে এসে তীরন্দাজদের জায়গা করে দিল গার্ডরা। লক্ষ্যস্থির করে তীর ছুঁড়ছে তারা। নিয়তির কি অদ্ভুত খেয়াল, প্রথম তীরটাই প্রধান পুরোহিতের নিতম্বে বিদ্ধ হলো। বাবারে বলে চেঁচিয়ে উঠল ধাওয়ান।

'সালে লোগ নিশানা ঠিক কারো!'

চারদিকে তীর এসে লাগছে, এই অবস্থায় আবার ধাওয়ানের নাগাল পেয়ে তার ঢোলা পোশাকের প্রান্ত ধরে টান দিল রানা। ধাওয়ান এক হাতে ঝুলছিল, নিতম্ব থেকে তীর খোলবার চেষ্টা করছিল অপর হাতে। কাপড়ে টান পড়ায় হাত থেকে রশিটা বেরিয়ে গেল।

সরাসরি রানার গায়ে এসে পড়বে ধাওয়ান। পতনের মধ্যে রয়েছে,

তারপরও প্রতিশোধ নেয়ার সাধ তার মেটেনি—ডান হাত বাড়িয়ে দিল ওদের দিকে, পাশ কাটাবার সময় ওকেও সঙ্গে নিতে চায়। রানা নিজের রশিটাকে দুলিয়ে দিল যতটা পারা যায়। দাওয়ানের হাত ওর নাগাল পেল না, তবে তার থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে পারল। 'শায়তান বাচাও! শায়তান মুখে বাচা দেও' বলে চিৎকার করতে করতে তিনশো ফুট নিচে নেমে গেল সে।

শমি ও গিল্টি মিয়াকে নিয়ে ঝুলন্ত সেতুর মাথায় উঠে এলো রানা। পাথুরে মাটিতে শুয়ে হাঁপাচ্ছে তিনজনই। তীরগুলো এখনও ওদের চারদিকে এসে পড়ছে। খানিক পর গিল্টি মিয়ার কানে একটা শব্দ ঢুকল। ঝট করে সিধে হয়ে সে, লড়াই করার জন্যে তৈরি। 'সার, দেকুন!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

সরু গিরিপথ দিয়ে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর একটা জীপকে ছুটে আসতে দেখা গেল। জীপ থেকে একদল সৈন্য নিয়ে নিচে নামলেন মেজর অশোক মেহতা। গিরিখাদের উল্টোদিক থেকে আরও এক ঝাঁক তীর ছুটে আসতে দ্রুত কাভার নিলেন তাঁরা। তারপর শুরু হলো লক্ষ্যস্থির করে রাইফেলের গুলিবর্ষণ। উল্টোদিকের কারনিস থেকে টপাটপ নিচে পড়তে লাগল ঠগী তীরন্দাজরা। তারপরই দেখা গেল ওদিকের টানেলের মুখ থেকে আরও সৈন্য কারনিসে বেরিয়ে আসছে। বাকি তীরন্দাজকে গ্রেফতার করল তারা। বাঁধা হচ্ছে রশি দিয়ে। টানেলের মুখের কাছে ছোট্ট একটা মিছিল তৈরি হলো। মিছিলটার সামনে রয়েছে বালক মহারাজা পবনম বৈশাখম। অত দূর থেকেও গিল্টি মিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল সে, তারপর হাত নাড়ল। মাথা থেকে সুতি ক্যাপটা নামিয়ে তার উদ্দেশে নাড়ল গিল্টি মিয়া। সৈন্যদের ডেকে নিয়ে আসায় তার প্রতি ওরা তিনজনই খুশি।

কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে কুমির দেখছে শমি। বলল, 'আমার ধারণা শুকদেব দাওয়ান যা চেয়েছিল তাই পেয়েছে।'

'বোধহয় না,' বলল রানা। পকেট থেকে ছোট্ট পাউচটা বের করল ও 'রত্নগুলো আসলে এটায় রেখেছিলাম।'

এরপর খনির ভেতর ঢুকে পায়ের শেকল কেটে শিশু-কিশোরদের উদ্ধার করল ওরা। রানা ওদেরকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সপ্তপুরী গ্রামে ফিরতে চাইলেও, শমির বিশেষ অনুরোধে চৌপল প্রাসাদে কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিল ওরা। শমি যুক্তি দেখাল, বাচ্চাগুলো অসুস্থ আর দুর্বল। প্রাসাদে ভাল মন্দ খাবারের কোন অভাব নেই, ডাক্তার আর ওষুধ-পত্রও পাওয়া যাবে। সে চায়, গ্রামে ওরা সুস্থ ও তাজা হয়ে ফিরুক। তবে গিল্টি মিয়াকে গোপনে আরও একটা কারণ দেখিয়েছে শমি। সেটা হলো—কোন প্রাসাদে থাকার অভিজ্ঞতা হাতছাড়া করতে রাজি নয় সে।

বালক মহারাজা পবনম বৈশাখম দূর গ্রাম থেকে মিস্ত্রী ও কারিগর আনিয়ে শয়তানের সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেলবার নির্দেশ দিল। মেজর মেহতার পরামর্শে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত একজন অফিসারকে প্রাইম মিনিস্টার নিয়োগ করল সে। নতুন প্রাইম মিনিস্টার নিয়োগ করলেন সুস্থ স্বাভাবিক প্রহরী, মন্দিরের

পুরোহিত ইত্যাদি। শয়তানের মূর্তি সরিয়ে তার জায়গায় হিন্দু ধর্মের বিধান অনুসারে দেব-দেবীদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হলো। মহারাজা রানাকে অনুরোধ করল, স্বপ্নপুরী গ্রামে ফেরার সময় ও যেন শিবলিঙ্গটা সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

এক হপ্তা পর স্বপ্নপুরীর কাছাকাছি একটা পাকা রাস্তায় ওদেরকে পৌঁছে দিল মেজর মেহতার কয়েকটা জীপ ও ভ্যান। অন্যান্য গ্রামের ছেলেরা সংখ্যায় ছিল প্রায় দুশো। তাদেরকে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে সৈন্যরাই। স্বপ্নপুরীতে ওরা ফিরল একশো বাইশ জন শিশু-কিশোরকে নিয়ে।

মেইন রোড থেকে পায়ে হেঁটে গ্রামে ঢুকছে ওরা। চারদিকের দৃশ্য মাত্র এই ক'দিনে সম্পূর্ণ বদলে গেছে দেখে ওরা তিনজন একেবারে তাজ্জব। অনুর্বর, ধূসর ও নিষ্প্রাণ এলাকাটা যেন অন্য কোথাও ফেলে দিয়ে এসেছে কেউ।

ঝর্ণার পানি কলকল ছলছল শব্দে নাচতে নাচতে ছুটছে। জলের ধারে গাছে গাছে নতুন পাতা। বোঁটায় বোঁটায় ফুল ও কুঁড়ি।

গ্রামের ভেতর আরও অবাক করা কাণ্ড চোখে পড়ল। লোকজন কি এক উদ্যমে নিজেদের ভাঙাচোরা ঘর-বাড়ি মেরামত করছে, কিংবা পুরানোটা ফেলে দিয়ে নতুন করে বানাচ্ছে। গ্রামের পাশের খেতগুলোয় চাষীরা বীজ রোপণে ব্যস্ত।

হারানো বাচ্চাদের সবাইকে ফিরে আসতে দেখে আনন্দে-উল্লাসে-উৎসবে মেতে উঠল গোটা স্বপ্নপুরী গ্রাম। যে যার হাতের কাজ ফেলে পড়িমরি করে ছুটে এলো। সন্তান ফিরে পেয়ে মায়েরা আত্মহারা। কিশোররা শিবলিঙ্গটা বয়ে আনছে দেখে গ্রামের মহিলারা উলুধ্বনি দিল। চারদিকে হাসি-কান্নার ঢল নেমেছে।

তারপর দেখা গেল সেই পুরোহিত দেবলিঙ্গমকে। মুগ্ধ বিস্ময়ে রানার দিকে ঝাড়া এক মিনিট নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকার পর সে বলল, 'আমরা জানতাম আপনারা ফিরে আসছেন।'

'কি করে? আবার স্বপ্ন দেখলেন নাকি?'

মাথা নাড়ল দেবলিঙ্গম। তারপর হাত তুলে গ্রামের চারদিকটা দেখাল। 'যখন দেখলাম আমাদের গ্রামে জীবন ফিরে আসছে।'

মাথা ঝাঁকাল শমি। 'এরকম মিরাকল আগে কখনও দেখিনি আমি। এ যে মিরাকল, স্রেফ অলৌকিক ঘটনা, এতে আর কোন সন্দেহ নেই।' তার সারা মুখে উজ্জ্বল হাসি। মিরাকল যে শুধু ঘটতে পারে তা নয়, মাঝে-মধ্যে সত্যি ঘটেও।

দেবলিঙ্গম হাসল। 'এখন আপনারা নিজেই প্রমাণ পেলেন ফিরিয়ে আনা রত্নগুলোর কী গুণ।'

পকেট থেকে পাউচ, পাউচ থেকে রত্ন তিনটে বের করল রানা। 'হ্যাঁ, এগুলোর ক্ষমতা আমি দেখেছি।'

দেবলিঙ্গমের অনুরোধে পঞ্চায়েত-প্রধান নটরাজন গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে রত্ন তিনটে রানার কাছ থেকে গ্রহণ করল। নটরাজন একা নয়, দেবলিঙ্গম সহ গ্রামবাসী সবাই মাথা নিচু করে পাথরগুলোকে সম্মান জানাল। তারপর নিজেদের

পবিত্র মন্দিরের দিকে হাঁটা ধরল তারা, পাথরগুলো যেখানে রাখা হবে। গিল্টি মিয়া ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে নিচিকের সঙ্গে যোগ দিল শমি।

গ্রামবাসীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে একটা রাত থাকতে হলো ওদেরকে। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর নটরাজন ও দেবলিঙ্গম ওদের তিনজনকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকল। 'এই ঘরটায় আপনারা স্বামী-স্ত্রী থাকবেন,' বলল দেবলিঙ্গম। 'এটা আসলে তৈরিই করা হয়েছে আপনাদের জন্যে।' ওরা দেখল, বিছানায় ফুল ছড়ানো রয়েছে। চাদরটাও মনে হলো নতুন ভাঁজ খোলা। খাটের ওপর পাশাপাশি দুটো বালিশ। 'সংলগ্ন বাথরুম,' একটা দরজা দেখিয়ে আবার বলল দেবলিঙ্গম। 'টেবিলের ওপর কিছু ফল, খানিকটা আঙুরের রস আর পানি রাখা আছে। ভাই গিল্টি, চলুন, এবার আপনাকে আপনার ঘরটা দেখিয়ে দিই।'

গিল্টি মিয়াকে নিয়ে ওরা দু'জন কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে দু'কোমরে হাত রেখে জানতে চাইল শমি, 'এটা কি ঘটল?'

'আমারও তো একই প্রশ্ন।' অবাক রানা ছোট্ট করে একটা ঢোক গিলল।

'এর একটা ব্যাখ্যা এই হতে পারে—তুমি ওদের মস্ত উপকার করেছ, তার প্রতিদান দিচ্ছে ওরা—এক রাতের জন্যে আমাকে তোমার হাতে নৈবেদ্য হিসেবে তুলে দিয়ে।'

'এর আরেকটা ব্যাখ্যা এ-ও হতে পারে। কেউ হয়তো ওদেরকে ভাবতে প্ররোচিত করেছে যে আমরা আসলে স্বামী-স্ত্রীই।'

'প্ররোচিত করেছে? কে?' শমিকে দেখে মনে হলো, পরিচয় জানতে পারলে এখনি তার ঘাড় মটকাবে।

নিরীহ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তুমি নও তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ!' বলে রানার কাছে সরে এসে ঘনিষ্ঠ হবার ভান করল শমি, তারপর হঠাৎ ওর কানে কামড় দিল।

ব্যথায় উফ্ করে উঠল রানা।

'ইস্, লাগল?' বলে রানার গায়ে সেঁটে এলো শমি। 'দেখি তো!' কিন্তু কিছুই হয়নি, দেখে ওর গালে গাল ঠেকাল সে। 'আমি জানি,' ফিসফিস করে বলল, 'দেবলিঙ্গমের এই ভুল ধারণার জন্যে কে দায়ী।'

'দায়ী যেই হোক, ভুল ধারণাটা ভাঙিয়ে দেয়া তো আসলে এক মিনিটের কাজ। আমি যাচ্ছি—'

রানাকে পিছন ফিরতে দেখে খামচে ধরল শমি ওর জ্যাকেটের হাত। 'আরে, আরে! করো কি!'

'কি ব্যাপার?' অবাক হচ্ছে রানা। 'তুমি চাও না ভুলটা ভেঙে দেয়া হোক?'

'সত্যিই ভুল তা কে বলল তোমাকে? আর যদি হয়ও, সে-ভুল আমার বা তোমার তো নয়, তাই না? অন্য কারও ভুলের জন্যে কেউ কি আমাদের দোষ দিতে পারবে? উঁহুঁ! তুমিই বলো, সবার সব ভুল কি কখনও ভাঙানো যায়? যায় না যে যার ভুল নিয়ে।' হাসছে শমিতা।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিকই বলেছ। আমরা তো নেহায়েত পরিস্থিতির অসহায় শিকার! আরেকজনের ভুলের বোঝা বইছি!'

দুষ্টুমি হাসিতে মুখ ভরিয়ে দু'হাত ধরে কাছে টানল শমি রানাকে। ওর নরম ঠোঁটে নেমে এলো রানার নিষ্ঠুর একজোড়া ঠোঁট।

পরদিন হাতির পিঠে চড়ে বাসস্ট্যান্ডে, সেখান থেকে রেলস্টেশন, তারপর ট্রেন ধরে সোনাই রূপাই শহরে পৌঁছল ওরা। দিল্লিতেও যাওয়া হলো···তবে সে অন্য গল্প।

***